রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও জননেতা জ্যোতি বসুর জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

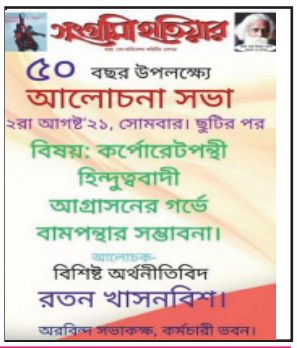

বিশেষ প্রথম ই-সংস্করণ, জুন ২০২১ ■ ৪৯তম বর্ষ

কেন্দ্রীয় রক্তদান কর্মসূচী

দেবাশীষ রায়

কর্মচারী আন্দোলনের অঙ্গীভূত সামাজিক দায়বদ্ধতায় অঙ্গীকারবদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে

উদ্বোধক ডাঃ মানস গুমটা

স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হল কলকাতাস্থিত কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে বিগত ১২ জুলাই ২০২১, সোমবার। কেন্দ্রীয় কমিটি আহুত এদিনের রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

বিজয় শঙ্কর সিংহ

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং এ্যাসোসিয়েশন অপ হেলফ সার্ভিস ডক্টরস্-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মানস গুমটা।

উদ্বোধনী সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। তিনি বলেন ১২ জুলাই তারিখটি পশ্চিমবাংলার শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষক যুক্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিন। কারণ ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবাংলার উত্তাল পরিস্থিতির গর্ভে আত্মপ্রকাশ করেছিল শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক যুক্ত আন্দোলন কমিটি ১২ই জুলাই কমিটি। পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই কমিটির ভূমিকা অপরিসীম। পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সুমহান ঐতিহ্য রয়েছে রক্তদানের ক্ষেত্রে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গোটা রাজ্যজুড়েই দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিপালনে রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করে চলেছে। সংগঠনের এই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা বারে বারে অভিনন্দিত ও স্বীকৃত হয়েছে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী স্তরে।

রক্তদান কর্মসূচী চলছে

এদিনের কর্মসূচীতে রক্তদাতা সহ উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিপালনে রাজ্য

উদ্বোধককে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে

কো-অর্ডিনেশন কমিটি তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কর্মসূচীর উদ্বোধক

অপেক্ষারত রক্তদাতারা

ডাঃ মানস গুমটা শুরুতেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে অভিনন্দন জানান শুধুমাত্র

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রসঙ্গে
সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদের জন্য ১.৭. ২০২১ থেকে ১১ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রতি বছর জানুয়ারি ও জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা ভোগ্য পণ্যের মূল্যসূচক (সি পি আই) অনুযায়ী মহার্ঘভাতা পেয়ে থাকেন। গত বছর (২০২০) কোভিড অতিমারির কারণে জানুয়ারি ও জুলাই মাসে প্রাপ্য দু'কিস্তি এবং এই বছরের (২০২১) জানুয়ারি মাসের মহার্ঘভাতা প্রদান বন্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণাও করা হয়েছিল, ২০২০ সালের জানুয়ারি, জুলাই ও ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে মূল্যসূচক অনুযায়ী প্রদেয় মহার্ঘভাতা প্রদান বন্ধ রাখা হলেও, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তা দিয়ে দেওয়া হবে, তবে তা এরিয়ার পেমেন্ট ছাড়াই দেওয়া হবে। সেই মোতাবেক সাম্প্রতিক ঘোষণায় যে ১১ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদানের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে ২০২০-র জানুয়ারি, জুলাই এবং ২০২১-র জানুয়ারিতে প্রাপ্য মহার্ঘভাতাও রয়েছে।

কিন্তু মহার্ঘভাতা প্রাপ্তির প্রশ্নে আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বহু টাল বাহানার পর ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সংশোধিত বেতনক্রম অনুযায়ী বেতনভাতা পাওয়া যায় ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে (২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে নোশনাল ফিক্সেশনের ভিত্তিতে)। বেতন কমিশনের সুপারিশ যখন কার্যকরী হয়, তার প্রাক-মুহূর্তে ও অংশোধিত বেতনক্রমে বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা (৪৮ শতাংশ) বকেয়া ছিল। কিন্তু বেতন কমিশন ও সরকার উভয়েই প্রসঙ্গে নীরব থাকে। এমনকি সংশোধিত বেতন চালু হওয়ার পর প্রথম মাসের পে-স্লিপে মহার্ঘভাতার কলামটিকেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট। নতুন বেতনক্রমে শুরু থেকেই মহার্ঘভাতার যে অধিকার কর্মচারীরা অর্জন করেছেন তাকে অস্বীকার করা। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি অতি দ্রুত সরকারের কাছে পত্র মারফৎ প্রতিবাদ জানায়। সংগঠনের এই তৎপরতায় পে-স্লিপে দ্বিতীয় মাস থেকেই মহার্ঘভাতার কলামটি ফিরে আসে। কিন্তু তারপরেও প্রায় ১১ মাস ঐ কলামে Nil বা শূন্য লেখা ছিল। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সংশোধিত বেতনক্রমে (৭ম বেতন কমিশন) প্রাপ্ত মহার্ঘভাতার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭ শতাংশ। অর্থাৎ রাজ্য কর্মচারীদের বকেয়ার পরিমাণও হয় ১৭ শতাংশ। এই ১৭ শতাংশের বিভাজনটা ছিল এইরকম---১.৭.১৬—২%, ১.১.১৭—২%, ১.৭.১৭—১%, ১.১.১৮—২%, ১.৭.১৮—২%, ১.১.১৯—৩%, ১.৭.১৯—৫%। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৩% মহার্ঘভাতা প্রদানের ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। লক্ষ্যনীয় হল এবারেও মহার্ঘভাতা ঘোষণার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় হার অনুসরণ করা হল না। কারণ কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘভাতা (যা আমাদের অর্জিত অধিকার) প্রদান করতে হলে প্রথম দু'কিস্তিতে প্রাপ্য হার ৪ শতাংশ। আর তিন কিস্তিতে হার ৫ শতাংশ। কোনো অবস্থাতেই তিন শতাংশ হয় না। এক কথায় বলা যায়, পুরনো বেতনক্রমে যেমন, নতুন বেতন ক্রমেও যখন খুশি, যা খুশি মহার্ঘভাতা দেওয়ার পরিকল্পনাকে চালু রাখা হল। যখন পেট্রোপণ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যের তীব্র মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, সেই সময়ে মহার্ঘভাতার বিপুল পরিমাণ বকেয়া রাখার অর্থ কর্মচারীদের বেতন সঙ্কোচন ঘটানো। কোভিড অতিমারির সংক্রমণজনিত চিকিৎসায় যখন কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত বহু কর্মচারী অতিরিক্ত খরচের ধাক্কায় দিশেহারা, তখন মহার্ঘভাতা বকেয়া রাখা অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বলে সংগঠন মনে করে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি রাজ্য সরকারের কাছে অবিলম্বে বকেয়া মহার্ঘভাতা কেন্দ্রীয় হার অনুযায়ী প্রদানের দাবি জানাচ্ছে। ইতোমধ্যেই সংগঠন সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচীতে (১৫ জুলাই, '২১) অন্যান্য দাবির সাথে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবি নিয়েও রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচী করেছে। আগামী আগস্ট মাসে একেবারে ব্লক থেকে শুরু করে মহকুমা ও জেলাস্তরে এবং সবশেষে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কেন্দ্রীয় জমায়েতের মাধ্যমে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবির সাথে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবি নিয়েও সংগঠন সোচ্চার হবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে। □

১৫ জুলাই সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচী

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন (AISGEF) এর আহ্বানে চার দফা দাবিতে গোটা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিপালিত হল প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচী বিগত

পূর্বাঞ্চল

১৫ জুলাই ২০২১। এদিন আমাদের রাজ্যে কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে কলকাতার ৭টি অঞ্চলসহ ২১টি

মহাকরণ অঞ্চল

জেলা সদর, মহকুমা সদর এবং বিভিন্ন জেলার ব্লক ও সেক্টর স্তরে, বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরে কর্মচারী সমাজ প্রতিবাদে সামিল

লবণহ্রদ অঞ্চল

হন। টিফিন বিরতিতে অনুষ্ঠিত এদিনের কর্মসূচীতে কোভিড বিধি মেনেই কর্মচারীরা তাদের বঞ্চনা-ক্ষোভ ব্যক্ত করেন।

● সকলের জন্য বিনামূল্যে ভ্যাকসিন প্রদান ● শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ ও নিয়োগের ক্ষেত্রে

নদীয়া জেলা

অস্থায়ী কর্মচারীদের অগ্রাধিকার প্রদান ● কেন্দ্রীয় হারে ১৮% বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান ● নীতিহীন ও প্রতিহিংসামূলক বদলীর আদেশনামা প্রত্যাহার ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সহ

● ষষ্ঠ তৃতীয় প্রথম কলমে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি / ৫৬ /২১ তারিখ ঃ ২২-০৭-২০২১

প্রধান সচিব
অর্থ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

বিষয় ঃ সরকারী কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের দিনেই পেনশন এবং গ্র্যাচুয়িটি প্রদান সংক্রান্ত স্কীমের যথাযথ রূপায়ণ ও ০১/০১/২০১৬ পরবর্তী পেনশনারদের পেনশন, ফ্যামিলি পেনশন, গ্র্যাচুয়িটি এবং কমিউটেশনের সংশোধিত সুযোগ সুবিধার দ্রুত নিষ্পত্তি সম্পর্কে

মহাশয়,

আপনি সম্যকভাবে অবহিত আছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৬ সাল থেকে অবসর গ্রহণের দিনেই সরকারী কর্মচারীদের পেনশন এবং গ্র্যাচুয়িটি প্রদান সংক্রান্ত স্কীম চালু করে এবং তা সফলভাবে রূপায়ণের জন্য অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, গত কয়েকমাস ধরে সরকারী কর্মচারীদের নির্ধারিত অবসরগ্রহণের দিন পি পি ও বা গ্র্যাচুয়িটি প্রভৃতি প্রাপ্য সুবিধাদির নিষ্পত্তি ঘটছে না।

শুধুই তাই নয়, রোপা রুলস, ২০১৯ কার্যকরী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ০১/০১/২০১৬ পরবর্তী পেনশনারদের পেনশন, ফ্যামিলি পেনশন, গ্র্যাচুয়িটি এবং কমিউটেশনের সংশোধিত সুযোগ সুবিধা এখনও এক বিশাল সংখ্যক সরকারী পেনশনারগণ হাতে পাননি।

আপনি নিশ্চিত স্বীকার করবেন যে, এই অগ্নিমূল্যের বাজারে কোভিড অতিমারি পরিস্থিতিতে যথাসময়ে পেনশন কেসগুলির নিষ্পত্তি না হলে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা নিরতিশয় আর্থিক অসুবিধা ও বহুবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের মধ্যে সময়ন্বয় সাধন এবং এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সকলের দ্রুত সক্রিয় উদ্যোগ ব্যতিরেকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অবসরগ্রহণের দিনেই পেনশন এবং গ্র্যাচুয়িটি প্রদান সংক্রান্ত স্কীমের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হবে না। অন্যদিকে পেনশন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে মহাগাণনিক (নিরীক্ষা ও পরীক্ষা)-র দপ্তরের সকল আধিকারিক ও অর্থ দপ্তরের পেনশন সেলের দ্রুত সুস্পষ্ট বোঝাপড়ায় আসা প্রয়োজন, নতুবা ০১/০১/২০১৬ পরবর্তী পেনশনারদের সংশোধিত প্রাপ্য সুবিধাদির সময়ভিত্তিক নির্দিষ্ট নিষ্পত্তি বিধান সম্ভব হবে না।

আশাকরি, কোভিড অতিমারির এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে আপনি এ ব্যাপারে দ্রুত সবিশেষ হস্তক্ষেপ করবেন এবং সরকারী কর্মচারী ও পেনশনারদের গভীর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা নিরসনে উল্লিখিত সমস্যাবলীর আশু সমাধানে সহানুভূতিপূর্ণ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিজয়শঙ্কর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদকীয়

পেগাসাস বনাম গণতান্ত্রিক নজরদারি

'পেগাসাস', ইজরায়েলি সংস্থা এন এস ও-র তৈরি এই স্পাইওয়্যার নিয়ে এখন দেশীয় রাজনীতি সরগরম। যে কোনো অপ্রিয় বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করার যে অভ্যাস প্রধানমন্ত্রী রপ্ত করেছেন, এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তাঁর নীরবতা এবং তাঁর পারিষদবর্গের 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' গোছের বক্তব্য গোটা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে সন্দেহ নেই। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচক কিছু ব্যক্তির (অবশ্য মন্ত্রিসভায় আলো করে থাকা দু-একজন সদস্যের নামও তালিকায় রয়েছে, তবে তা নিতান্তই ব্যতিক্রম)। অ্যান্ড্রয়েড ফোনে বা আই ফোনে গোপনে এই স্পাইওয়্যারের অবৈধ অনুপ্রবেশের দায় কার, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইজরায়েলি সংস্থাটির দাবি, তারা যে কোনো দেশের সরকার বা সরকার পরিচালিত কোনো তদন্তকারী সংস্থা ব্যতিরেকে আর কাউকে এই নজরদারির 'সফটওয়্যার' বিক্রি করে না। এন এস ও-র এই দাবি যদি সঠিক হয়, তাহলে তা দুটো সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করে—হয় ভারত সরকার বা তার পরিচালনাধীন কোনো গোয়েন্দা সংস্থা এই স্পাইওয়্যারের ক্রেতা অথবা কোনো বিদেশী সংস্থার মাধ্যমে এই নজরদারি বা আড়িপাতার কাজটি করা হচ্ছে। প্রথম সম্ভাবনাটি যদি সঠিক হয়, তাহলে স্বাভাবিক প্রশ্ন হল, সম্মানজনক পেশা বা কাজের সাথে যুক্ত কিছু ব্যক্তির গতিবিধির ওপর গোপন নজরদারি কেন সরকারের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে? নজরদারির আওতায় রয়েছেন বলে যাঁদের নাম শোনা যাচ্ছে, তাঁরা প্রায় সকলেই সম্প্রতি বিভিন্ন ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। যদিও এঁরা সকলেই রাজনীতিবিদ নন, কিন্তু সচেতন নাগরিক হিসাবে সংবিধান স্বীকৃত যে মত প্রকাশের অধিকার, তার ভিত্তিতে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এই সমস্ত সমালোচনামূলক মতামত সরকারের পছন্দ নাও হতে পারে। অপছন্দের মতামতকে 'বিরোধী কণ্ঠস্বর' হিসেবে চিহ্নিত করে, যুক্তির সাহায্যে তাকে খণ্ডন করাও একটি গণতন্ত্রসম্মত পন্থা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত একটি সরকারের গণতন্ত্রসম্মত পন্থায় জবাবদিহি স্বাভাবিক এবং আকাঙ্ক্ষিতও বটে। কিন্তু তা না করে, 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' গোছের মনোভাব নিয়ে অপছন্দের লোকেদের ব্যক্তি জীবনে উঁকি মারা বা ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সীমাটিকে লঙ্ঘন করার অর্থ এক ঢিলে গণতন্ত্রের দুটি পাখিকে তাক করা—প্রথমত, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের যুক্তির সাহায্যে বিরোধী মতকে খণ্ডন করার গণতান্ত্রিক পথটিকে উপেক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, একজন নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার যে পরিসর তাকেও লঙ্ঘন করা। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার পরিসরটিও গণতন্ত্রের একটি ভূষণ। যেখানে উঁকি-ঝুঁকি মারা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক তো বটেই, এমনকি ব্যক্তি নাগরিকের মর্যাদা হানিকর এক স্বৈরাচারী প্রবণতাও বটে।

এ তো গেল যদি সরকারী উদ্যোগে বা পৃষ্ঠপোষকতায় আড়িপাতার ঘটনা ঘটে থাকে। কিন্তু যদি দেখা যায় সরকার আড়ি পাতা হয়নি বলে যা দাবি করেছে তা যথার্থ, অথচ বেশ কিছু ফোনে চুপিসারে পেগাসাস যে ঢুকে পড়েছে, তা ইতোমধ্যেই ফরেনসিক রিপোর্টে প্রমাণিত। তাহলে কী ধরে নিতে হবে, কোনো বিদেশী সংস্থা আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নজরদারি চালাচ্ছে? এ তো তাহলে সরাসরি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত! সেক্ষেত্রে দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে থেকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর বৈদেশিক শক্তির অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও, 'দেশপ্রেম' ও 'জাতীয়তাবাদ'-এ আকণ্ঠ ডুবে থাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হিরন্ময় নীরবতা বিস্ময়কর নয় কি? না কি, ডাল মে কুছ কালা হ্যায় বলেই তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন? সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে ইতোমধ্যেই জোরালো আওয়াজ সংসদের ভেতরে ও বাইরে উঠতে শুরু করেছে। অর্থাৎ কেঁচো খোঁড়ার কাজ শুরু হয়েছে, সাপ বেরনোর অপেক্ষা।

ফোনে আড়িপাতার পাশাপাশি সমালোচনামূলক কণ্ঠস্বরকে 'বেআইনী কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন' (ইউ এ পি এ) বা জাতীয় সুরক্ষা আইন (এন এস এ)-এর মতো কালাকানুন প্রয়োগ করে স্তব্ধ করার স্বৈরতান্ত্রিক অপচেষ্টাও আমরা লক্ষ্য করছি, যার বিয়োগান্তক পরিণতি হল অশীতিপর অসুস্থ জেসুইট ফাদার স্ট্যান স্বামীর জেল হেফাজতে মৃত্যু। অর্থাৎ রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের লক্ষ্যে প্রণীত আইনগুলিকে ব্যবহার করে সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের সমালোচনাকে বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই বিষয়টিকে কিন্তু শুধুমাত্র আইনের অপপ্রয়োগ, এভাবে দেখলে লঘু করে দেখা হবে। রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সরকারের সমালোচনাকে একই পাল্লায় ওজন করার উদ্দেশ্য হল, এটা বোঝানো যে সরকার ও রাষ্ট্র সমার্থক। আবার সরকার মানে দু-এক জন ব্যক্তিই সর্বেসর্বা। মানে, ব্যাপারটা দাঁড়াল দু-এক জন ব্যক্তিই কার্যত রাষ্ট্র—এটি ফ্যাসিস্টধর্মী রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। অতীতের দিকে ফিরে তাকালে ইতালি, জার্মানি, স্পেন বা জাপানের ইতিহাসে এই প্রবণতার সন্ধান পাওয়া যাবে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, উপরোক্ত প্রবণতা সম্পন্ন শাসকেরাই জোট বেঁধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গড়ে তুলেছিল 'অক্ষ শক্তি'। ইংরাজী প্রবাদ বাক্যটি মনে করুন—'বার্ডস্ অফ এ ফেদার ফ্লক টুগেদার'! শুধু অতীত কেন, বর্তমান সময়েও হাতে গরম উদাহরণ রয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প আর নেতানহু-র সাথে কোলাকুলি আর গলাগলি কি এমনিই?

আমরাই রাষ্ট্র, আমরাই স্বয়ম্ভু এই ভাবনাই কিন্তু চেতনার স্তরে ডায়ালেকটিক্যালি নিরাপত্তার অভাব বোধের জন্ম দেয়। তোষামোদ আর জো-হুজুর মানসিকতার বাইরে একটু ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে সামান্য অপছন্দের কথা কেউ বললেই, তাকে শত্রু হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হয়। অপছন্দের মাত্রা অনুযায়ী গৃহবন্দী, (কাশ্মীরে বিরোধী দলের নেতারা), জেলবন্দী (স্ট্যান স্বামী, ভারভারা রাও সহ অনেকেই) বা নজরবন্দী (পেগাসাসের ব্যবহার) করা হয়।

আবার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে সরকার তথা স্বয়ম্ভু শাসকের চোখে 'বেয়াদপ' এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেও টাইট দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যেমন সম্প্রতি বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ভাস্কর' পত্রিকার দপ্তরে সি বি আই হানা দিল। নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব থেকেই 'ডাইনী খোঁজা' শুরু হয়, এবং তার জন্যই প্রয়োজন হয় পেগাসাসের। অতীতের পাতাতেও এমন উদাহরণ পাওয়া যাবে। তবে তখনও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির হাত ধরে 'স্পাইওয়্যার' আসেনি, তাই ব্যবহার করা হত মানবস্পাই বা গুপ্তচর।

কেন্দ্রের বর্তমান শাসকদলের এই ধরনের কার্যকলাপে কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করছেন দেখেই অবাক লাগছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, যার জন্মই ফ্যাসিবাদী মতাদর্শকে ভিত্তি করে, সেই সংঘ পরিচালিত রাজনৈতিক দল যে এই পথই অনুসরণ করবে, তাই তো স্বাভাবিক। এরা যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্ত বৈশিষ্টগুলিকে মর্যাদা দিত, তাহলেই বরং অবাক হওয়ার মতো ঘটনা ঘটত। তবুও বর্তমান শতাব্দীতে, বিশেষত ২০০৮ সালে শুরু হওয়া বিশ্ব পুঁজিবাদী সঙ্কট উত্তরপর্বে আমাদের দেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা রঙের যে ফ্যাসিবাদী বা স্বৈরতান্ত্রিক দলগুলি শক্তি সঞ্চয় করছে, তাদের সাথে বিংশ শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে দাপিয়ে বেড়ানো ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক দলগুলির একটা পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি হল, বর্তমান সময়ের দলগুলি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সুযোগ পেলে, তাদের বিংশ শতাব্দীর পূর্বসুরীদের ন্যায় দেশে দেশে গণতন্ত্রের যে কাঠামো তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় না। বরং বাহ্যিক কাঠামোটিকে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা (যেমন নির্বাচন) সহ টিকিয়ে রেখে, অন্তর্বস্তুগত দিক থেকে এর রূপান্তর ঘটাতে সচেষ্ট হয়। এই যে কাঠামোকে টিঁকিয়ে রাখা হয়, তা-ই কিন্তু বিরোধিতার স্পেসও তৈরি করে দেয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দ্বারা সৃষ্ট প্রবল চাপের (রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন) বিপরীতে স্পেসটাকে বড় করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হলেও, প্রতিস্পর্ধী প্রবল চাপে অসম্ভব নয়। তবে এই চাপ নিউটনীয় গতিসূত্র অনুযায়ী সমান ও বিপরীত সরল রৈখিক চাপ নয়। কারণ তাহলে স্থিতাবস্থা তৈরি হবে। বর্তমান অবস্থার থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয় কর্মকাণ্ড। অর্থাৎ রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী সমূহের প্রচার ও প্রসার এবং স্থানীয় স্তরে প্রশাসনিক ক্ষমতার মাধ্যমে বিকল্প কর্মসূচীর রূপায়ণ। জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে আনুগত্য সৃষ্টির জন্য ফ্যাসিস্ট শক্তি বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করে, যার মাধ্যমে 'ক্যামোফ্লেজ' করে প্রকৃত উদ্দেশ্যকে তারা আড়াল করে। এগুলির ওপর গণতান্ত্রিক নজরদারি রেখে, নিবীড় প্রচার ও বিকল্প কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্যামোফ্লেজের মুখোশগুলোকে ছিঁড়ে ফেলতে না পারলে, ফ্যাসিবাদী শক্তি জনচেতনায় তার আদর্শগত হেজিমোনিকে চাপিয়ে দেবেই। বিরোধী শক্তিকে যে গণতান্ত্রিক নজরদারিকে জোরদার করতে হবে, তার জন্য স্পাইওয়্যারের প্রয়োজন নেই। এর জন্য প্রয়োজন মানবহিতৈষী দায়বদ্ধতাজনিত গণতান্ত্রিক চেতনা।

আর এস এস তার পরিবারের বিভিন্ন শাখা সংগঠনকে ব্যবহার করে যে কাজ করে, তাকে 'সোশ্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং' হিসেবে অভিহিত করছে আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান। সোশ্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ভিত্তিক পরিচিতি সত্তাকে জাগ্রত করে শোষিত-নিপীড়িত জনসমাজকে বহুধা-বিভক্ত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করে। এর মধ্য দিয়ে দুটো উদ্দেশ্য সাধন করে ফ্যাসিস্ট ধর্মী শক্তি—(১) পরিচিতি সত্তার ভিত্তিতে যে মেকী জাত-পাত ভিত্তিক দম্ভ তৈরি হয়, তা আনুভূমিক বা হরাইজেন্টালি প্রবাহিত হয়ে সম অবস্থানে থাকা অন্যান্য গোষ্ঠীর থেকে স্বাতন্ত্রবোধ তৈরি করে। যা কখনও কখনও বৈরীতাতেও পর্যবসিত হয়। অথচ এটি কখনই উল্লম্বে বা ভার্টিক্যালি প্রবাহিত হয়ে সমাজের বর্ণভিত্তিক হায়ারারখিয়াল বিভাজনকে চ্যালেঞ্জ জানায় না। ফলে বর্ণভিত্তিক সামাজিক শোষণ অব্যাহত থাকে। এবং (২) সামাজিক স্তরে আত্মপরিচিতির এই উস্কানি অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। বর্ণভিত্তিক সামাজিক শোষণ ও শ্রেণীভিত্তিক অর্থনৈতিক শোষণকে বজায় রাখার লক্ষ্যেই গৃহীত এই সোশ্যাল ইঞ্জিনীয়ারিংকে প্রতিহত করা ও ক্রমান্বয়ে কোণঠাসা করার জন্য যা প্রয়োজন তাকে কাউন্টার সোশ্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বলা ঠিক হবে না। কারণ 'কাউন্টার' কথাটির মধ্যে যে বিরোধিতার অর্থটি রয়েছে, তা একরৈখিক নেটাফিজিক্যাল ধারণা। এর মধ্য দিয়ে হিতে বিপরীত হতে পারে। কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীগুলি যুগ যুগ ধরে সামাজিক শোষণে অবদমিত থাকার ফলে, তাদের অতিসঙ্গত কিছু আকাঙ্ক্ষারও পূরণ হয় না। কাউন্টার সোশ্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ধারণায় গোষ্ঠীভিত্তিক পারস্পরিক বৈরীতাকে দূর করা গেলেও, সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি হয় না। বর্ণভিত্তিক ভার্টিক্যাল ল্যাডারেও আঁচ লাগে না। যা প্রয়োজন, তা হল বহুমুখী 'সোশ্যাল হারমোনাইজেশন'। এর ফলে গোষ্ঠী ভিত্তিক সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও আন্তঃগোষ্ঠী সম্প্রীতি যেমন জোরদার হবে, তেমনি বর্ণভিত্তিক সামাজিক শোষণকেও প্রতিহত করা সম্ভব হবে। সামাজিক স্তরে এই সমন্বয়মূলক কর্মসূচী শ্রেণী ঐক্যের ভিতকেও মজবুত করে। অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে শ্রেণী আন্দোলনকেও শক্তিশালী করবে। সোশ্যাল হারমোনাইজেশন এর লক্ষ্যে পরিচালিত পরিকল্পনা ও কর্মসূচী হবে শ্রেণী আন্দোলনের পরিপূরক। এর বিকল্প নয়। তাই সামাজিক স্তরে আর এস এস ও তার বিভিন্ন সংগঠনের তৎপরতা এবং রাষ্ট্রীয় স্তরে বি জে পি-র কর্মসূচীর যৌথ বিরোধিতায় গণতান্ত্রিক নজরদারিকে আরও শক্তিশালী করে এখনই উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। জনপরিসরে ফ্যাসিস্ট ভাবধারাকে রোখা ও পরাস্ত করার জন্য যা সবিশেষ জরুরী। □

৩০ জুলাই, ২০২১

শোক সংবাদ
স্মরজিৎ ভট্টাচার্য

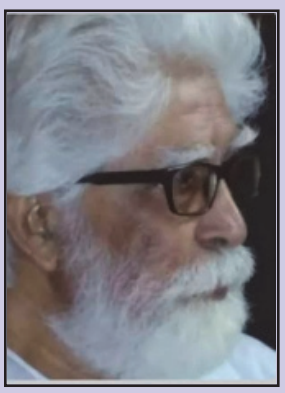

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, উত্তরাঞ্চলের প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড স্মরজিৎ ভট্টাচার্যের প্রয়াণে আমরা হারালাম একজন দায়িত্বশীল, নিষ্ঠাবান ও প্রতিবাদী এক সহযোদ্ধাকে। তিনি ছিলেন অপরাজেয়, সংগ্রাম আন্দোলনের একজন অকুতোভয় বীর সেনানী। তাঁর অমলিন স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁর পরিবার পরিজন ও অনুগামী সমাজকে জানাই সমবেদনা। □

কমরেড স্মরজিৎ ভট্টাচার্য লাল সেলাম
কমরেড স্মরজিৎ ভট্টাচার্য অমর রহে।

শ্যামচাঁদ মনিগ্রাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সভাপতি, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড শ্যামচাঁদ মনিগ্রাম ৭৮ বছর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হয়েছেন। কমরেড মনিগ্রামের প্রয়াণে আমরা হারালাম একজন দায়িত্বশীল, নিষ্ঠাবান আর মতাদর্শের প্রতি অবিচল এক সহযোদ্ধাকে। জীবনের কঠিন লড়াইয়ে তিনি ছিলেন অপরাজেয়, সংগ্রাম আন্দোলনের একজন অকুতোভয় বীর সেনানী। তাঁর অমলিন স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁর পরিবার পরিজন এবং অনুগামী সমাজকে জানাই সমবেদনা। □

কমরেড শ্যামচাঁদ মনিগ্রাম লাল সেলাম
কমরেড শ্যামচাঁদ মনিগ্রাম অমর রহে।

শান্তনু দাস

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মহাকরণ অঞ্চলের প্রাক্তন সম্পাদক এবং পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন-র প্রাক্তন দপ্তর সম্পাদক কমরেড শান্তনু দাস প্রায়ত হয়েছেন। তাঁর এই আকস্মিক জীবনাবসানে আমরা গভীর শোকাহত। কমরেড দাস-এর স্মৃতির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর পরিবার পরিজন সহ অনুগামীদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। □

কমরেড শান্তনু দাস লাল সেলাম
কমরেড শান্তনু দাস অমর রহে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

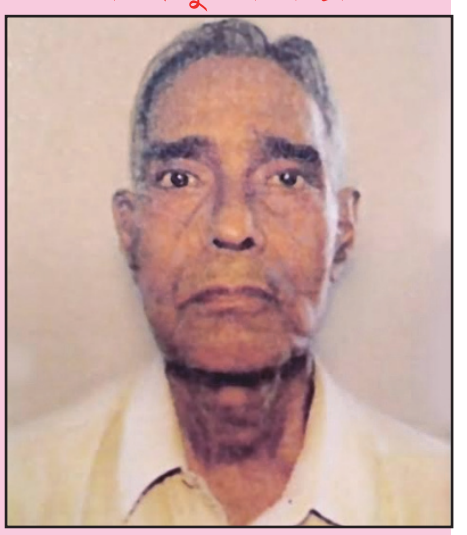

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের পুনর্গঠনকালের সাধারণ সম্পাদক এবং পেনশনার্স সমিতির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পবিত্র মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর অমলিন স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁর পরিবার পরিজন এবং অনুগামী সমাজকে জানাই সমবেদনা। □

কমরেড পবিত্র মুখোপাধ্যায় লাল সেলাম
কমরেড পবিত্র মুখোপাধ্যায় অমর রহে।

গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ

ইন্দ্রনীল সান্যাল

সন ১৮১৮। তৎকালীন মহারাষ্ট্রে শাসক পেশায়া বাজিরাও। উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী ফতোয়ায় অস্পৃশ্য মাহারদের পথ চলার সময়ে গলায় পিক্‌দান ও পিঠে ঝাঁটা ঝোলাতে হতো। পেশোয়া বাজিরাও এই সময়ে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। মাহার সম্প্রদায় এই সময়ে তাদের শাসক পেশোয়া বাজিরাওয়ের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে চায়, কিন্তু অস্পৃশ্যতার কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রত্যাখ্যাত মাহাররা দারিদ্রতার কারণে বাধ্য হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনা দলে যোগ দিতে। ১ জানুয়ারি ১৮১৮, ২৮ হাজার সৈন্যসমেত পেশোয়া বাজিরাও পরাস্ত হন মাত্র সাড়ে আটশো সৈন্যের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে। এই সাড়ে আটশো সেনার মধ্যে পাঁচশো জন ছিল মাহার। যুদ্ধে জিতে ব্রিটিশরা ভীমা কোরেগাঁওতে বিজয়স্তম্ভ বানায়। স্তম্ভে যুদ্ধে নিহত বাইশ জন মাহারের নাম লেখা আছে।

১৯২৭-এর ১ জুনায়ারি আম্বেদকর এই বিজয় স্তম্ভ পরিদর্শন করেন। মাহারদের কাছে এই স্তম্ভ উচ্চবর্ণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক নিদর্শন স্বরূপ।

২০১৮ সালে ১ জানুয়ারি ছিল সেই জয়ের ২০০ বছর। সংঘ পরিবার সেই দিনের দলিত জমায়েত ঘৃণার চোখেই দেখেছিল। সরকারী প্ররোচনায় সমাবেশে আগত দলিতদের সাথে সংঘ পরিবারের সংঘর্ষ হয়। পরবর্তী ৩ জানুয়ারি দলিতদের

আহ্বানে সর্বাত্মক বন্ধ হয়। ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী শাসক প্রমাদ গোণে। শ'য়ে শ'য়ে দলিত গ্রেপ্তার হন।

এই ঘটনার ছুতোয় স্ট্যান স্বামী, ভারভারা রাও, সুধা ভরদ্বাজ, সোমা সেন সহ ১৬ জন সমাজকর্মীকে সরকার গ্রেপ্ত করে UAPA ও NIA অ্যাক্টে। এঁদের প্রায় সকলেই ভীমা কোরেগাঁও-এর জমায়েতে ছিলেন না। কিন্তু এঁরা সকলেই স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে, দলিতদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের পক্ষে আন্দোলনে যুক্ত।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ততক্ষণ গণতন্ত্রের মুখোস পরে থাকে, যতক্ষন না সে নিজে কোণঠাসা হয়। গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ, প্রতিরোধে কোণঠাসা হলেই তার গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে স্বৈরতান্ত্রিক স্বরূপ উন্মোচিত হয়। শতাধিক বছরের ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে।

গত শতাব্দীর সাতের দশকের গোড়ায় দেশের অর্থনীতি এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয় প্রায় ২২ শতাংশ। সবচেয়ে গুরুতর সঙ্কট দেখা দেয় শিল্প ক্ষেত্রে। প্রায় তিন হাজার ইঞ্জিনীয়ারিং ও সুতাকল বন্ধ হয়ে যায়। শিল্পক্ষেত্রগুলি থেকে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই হচ্ছেন, বিপুল সংখ্যায় লে-অফ, বরখাস্তের ঘটনা নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়লাখনি জাতীয়করণ হওয়া সত্ত্বেও হাজার হাজার খনি শ্রমিক কোনো না কোনো অজুহাতে ছাঁটাই হয়ে গেছেন। ছোটো, অসংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রেও কর্মচ্যুতি ঘটছে। কৃষকরা ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে গোটা দেশজুড়ে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ আন্দোলন বিক্ষোভে ফেটে পরে। জনরোষ সামাল দিতে ব্যর্থ সরকার গোটা দেশজুড়ে জারি করে জরুরি অবস্থা। সমস্ত গণতান্ত্রিক, সাংবিধানিক অধিকার এক লহমায় কেড়ে নেওয়া হয়। বিনা বিচারে আটক করা হয় বিরোধী নেতৃত্ব সহ বহু মানুষকে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকে সেন্সরশিপের আওতায় আনা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন মধ্যরাতে অভ্যন্তরীন জরুরী অবস্থা জারি এবং পরবর্তী ১৯ মাস ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস অত্যন্ত কলঙ্কময়। এই স্বৈরাশাহী কায়েমের বিরুদ্ধে জনগণের লড়াই ১৯৭৭-এ স্বৈরাচারী শাসককে বিপুলভাবে পরাজিত করে। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

প্রাক স্বাধীনতাপর্বে ব্রিটিশরা দমনমূলক আইন ব্যবহার করতো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে দমন করার জন্য। স্বাধীনতা উত্তরপর্বে দেশের শাসক তা ব্যবহার করে শোষণকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। যেমন Defence of India Rules, Prevention of Detention

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

কলকাতার জাল টিকা কাণ্ড

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

কলকাতার কসবায় অবৈধ টিকাকাণ্ড প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকারের টিকাকরণ প্রক্রিয়াকেই। কসবা বিধানসভা এলাকার মধ্যে কসবা থানার কাছেই কলকাতা কর্পোরেশনের লেটারহেড, শিলমোহর ও নথিপত্র ব্যবহার করে দেবাঞ্জন দেব নামে শাসকদলের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি ১০ দিন ধরে ভুয়ো ভ্যাকসিন শিবির সেন্টার চালানোর ঘটনায় গোটা রাজ্যে হইচই পড়ে গেছে। ওই সেন্টারে ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন যাদবপুরের সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। কিন্তু তিনি কোনো শংসাপত্র না পাওয়ায় পুলিশে অভিযোগ জানান। তারপরই এই ঘটনায় অভিযুক্ত দেবাঞ্জন দেবকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নিজেকে কলকাতা পৌরসভার যুগ্ম সচিব হিসেবে পরিচয় দিত এই ভুয়ো আই এ এস। ওই ভ্যাকসিন সেন্টারে ভ্যাকসিনের নাম করে টিকা হিসেবে কী দেওয়া হয়েছে ও তা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে সেই ভেবে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত। ভ্যাকসিন নেওয়ার পর তাঁরা কেউই শংসাপত্র পাননি। তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু নেতাকে বিষয়টি আগেই জানানো সত্ত্বেও তারা কেউ গুরুত্ব দেননি। পৌরসভার অনুমতি ছাড়া এতদিন ধরে কীভাবে ভ্যাকসিন শিবির চললো তা নিয়ে অন্ধকারে স্বাস্থ্য ভবনও। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, ধৃত দেবাঞ্জন দেব শাসকদলের ঘনিষ্ঠ। সাংসদ শান্তনু সেন থেকে নারদায় অভিযুক্ত মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী, ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে তার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে এখনও। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠার ফলকে পৌরসভার প্রাক্তন মেয়র এবং বর্তমান প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে তার নাম খোদাই করা ছিল এই সেদিন পর্যন্ত। পরে তা ভেঙে ফেলা হয়। কালো কাঁচের গাড়িতে ঘোরা দেবাঞ্জন দেবের ভুয়ো সরকারী অ্যাকাউন্ট খোলা সহ আরও কীর্তি রয়েছে। যদিও মেয়র ফিরহাদ হাকিম সহ শাসক দলের অন্যান্য নেতারা তার সঙ্গে যোগাযোগের কথা অস্বীকার করছেন, প্রশ্ন উঠছে, কার সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতে শাসকদলের একজন সাংসদ ওই ভ্যাকসিন সেন্টারে গেলেন এবং টিকা নিলেন? সাংসদকে প্রভাবিত করার জন্য প্রভাবশালী সেই ব্যক্তির নাম পুলিশ প্রকাশ করতে চায়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরও কিছু প্রশ্ন উঠছে। দেবাঞ্জন ভ্যাকসিন পেল কী করে, সেই প্রশ্ন উঠেছে। কে তাকে ভ্যাকসিন যোগাড় করতে সাহায্য করেছে? এর পেছনে কত টাকার লেনদেন হয়েছে? রাজ্যে কি আরও এমন বেআইনি ভ্যাকসিন সেন্টার চলছে? গোটা রাজ্যের মানুষ যখন ভ্যাকসিনের জন্য হাহাকার করছেন, তখন ভ্যাকসিন নিয়ে দুর্নীতির পেছনে আরও কে কে আছে? থানার কাছেই কীভাবে ১০ দিন ধরে এরকম ভ্যাকসিন সেন্টার চালানো সম্ভব হল? সেখানে ভ্যাকসিনের নাম করে যা দেওয়া হয়েছে তা কি আদৌ করোনা ভ্যাকসিন?

কসবার রাজডাঙা নিউমার্কেটের কাছে একটি ব্যাঙ্কের ওপরে এই ভ্যাকসিন সেন্টার খোলা হয়েছিল। এলাকার মানুষকে বোকা বানিয়ে চলছিল ভ্যাকসিন দেওয়ার কর্মসূচী। অভিযুক্ত দেবাঞ্জন দেব সেখানে একটি অফিসও খুলেছিলেন। সেই অফিসে কলকাতা পৌরসভার লেটারহেড, শিলমোহর, পৌরসভার ছাপ মারা বিভিন্ন নথিপত্র, দেওয়ালে পৌরসভার ক্যালেন্ডার—সবই ছিল। দেখলে মনে হতো যেন পৌরসভারই কোনো অফিস। কসবা বিধানসভার অন্তর্গত এই এলাকাটি। ওই বিধানসভার বিধায়ক জাভেদ খান। তিনি রাজ্যের মন্ত্রীও বটে। ওই এলাকায় কোনো নির্মাণ বা অফিস খোলা তৃণমূল কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া হয় না। সেখানে কীভাবে একটি অফিস খুলে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়ে গেল?

সাংসদ মিমি চক্রবর্তীর দাবি, দেবাঞ্জন দেব তাঁকে গিয়ে বলেন যে, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করার জন্য উদ্বোধন করতে হবে সাংসদকে। তাই তিনি রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু কারোর মাধ্যমে সাংসদের কাছে পৌঁছেছিল দেবাঞ্জন, নাকি সাংসদ তাকে আগে থেকেই চিনতেন তা পরিষ্কার নয়। ভ্যাকসিন নেওয়ার পর চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেলেও সাংসদ কোনো সার্টিফিকেট না পেয়ে পুলিশে অভিযোগ জানান। তারপর প্রতারণার বিষয়টি সামনে আসতেই পৌরসভা নিজেদের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দাবি করে যে এই ধরনের ভ্যাকসিন শিবির চালাতে পৌরসভার যে অনুমতির প্রয়োজন হয় তা আদৌ নেওয়া হয়নি। তখন প্রশ্ন ওঠে যে এত ভ্যাকসিন কোথা থেকে এল? সব দায় ঝেড়ে ফেলে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান যে পৌরসভা থেকে কোনো ভ্যাকসিন সরবরাহ করা হয়নি। অভিযুক্ত দেবাঞ্জন দেবের বক্তব্য যে তিনি বাগড়ি মার্কেট থেকে ভ্যাকসিনগুলি কিনেছেন। কিন্তু খোলা বাজারে করোনার ভ্যাকসিন বিক্রি হয় না। ফলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের অসঙ্গতি প্রকাশ্যে এসেছে। উদ্ধার হওয়া ভ্যাকসিনগুলি জাল কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। দেবাঞ্জন দেবের অফিসে অভিযান চালিয়ে পুলিশ জাল পরিচয়পত্র সহ যে সমস্ত নথি বাজেয়াপ্ত করেছে তার মধ্যে স্বাস্থ্য ভবন থেকে করোনা ভ্যাকসিন রিকুইজিশনের ফর্মও আছে। তাহলে কি শাসকদলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে রাজ্যের সরকারী স্টোর থেকে ভ্যাকসিন হাতিয়েছিল দেবাঞ্জন দেব? তদন্তে নেমে তাকে কেন্দ্র করে একের পর এক প্রতারণার ঘটনা থেকে ভুয়ো কর্মকাণ্ডের বিষয়ে জানতে পারছেন তদন্তকারীরা।

অভিযুক্ত দেবাঞ্জন দেবের সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকা অ্যাকাউন্টে শাসকদলের একাধিক শীর্ষ নেতা, মন্ত্রী, সাংসদের এক মঞ্চে থাকার ছবি সামনে এসেছে। তার সঙ্গে শাসকদলের যোগাযোগ দু-এক দিনের নয়, বেশ কয়েক বছরের। রাজ্যে একের পর এক প্রতারক গ্রেপ্তারে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনের স্বরূপ উন্মোচিত হচ্ছে। এই দেবাঞ্জনের মতো আরও বহু নাম ছড়িয়ে রয়েছে গোটা রাজ্যে। যারা শাসক ঘনিষ্ঠ বলে মানুষ তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ভয় পান। তবে মানুষ প্রতিবাদ করছেন, রাস্তায় নামছেন। কসবার টিকা কেলেঙ্কারি এবং জালিয়াতির বিরুদ্ধে উপযুক্ত তদন্ত এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারি ও শাস্তির দাবিতে গত ২৮ জুন কলকাতা পৌরসভার সামনে বামপন্থী ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনগুলির শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলনে পুলিশ লাঠি চালায়। কোনো প্ররোচনা ছাড়াই প্রতিবাদীদের নির্মম ভাবে মারা হয়েছে, প্রিজন ভ্যানে টেনে হিঁচড়ে তোলা হয়েছে ও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ও টিকা কেলেঙ্কারিতে যুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ২৯ ও ৩০ জুন বিকেল পাঁচটায় রাজ্যের প্রতিটি থানার সামনে বিক্ষোভের কর্মসূচী পালন করে ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনগুলি। □

নজরুল—কালান্তরের জাগ্রত প্রতিনিধি

"গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"

যে কবি প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের প্রাণে ও শরীরে সঞ্চার করেছিল বিপুল তারুণ্যের ঐশ্বর্য, যাঁর সৃষ্টি নিপীড়িত গণমানুষের আকাঙ্খার, সম্ভাবনার, প্রতিবাদের, বিদ্রোহের ব্যতিক্রমী উচ্চারণ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল, দেশকালের জরা-শোক-অবক্ষয়-অন্ধকারকে নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করে সংগ্রামের আলোকিত চেতনাকে বিশ্বলোকে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে মহৎ প্রতিভা—তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। ব্রিটিশের রাজরোষ, কারাগার তাঁকে বন্দী করেছে, কিন্তু অকুতোভয় তিনি দ্বিগুণ আনন্দে প্রজ্বলিত হয়েছেন সত্যের সপক্ষে। তিনি সর্বহারার সাম্যবাদী কবি। বাঙালি জাতির সাম্প্রদায়িক সঙ্কটে তাঁর লেখনী ছিল সৃষ্টিশীল ও ঐক্যবদ্ধ আত্মশক্তির উদ্বোধনে নিরলস। তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত সর্বকালের বাঙালীকে উদ্দীপিত ও উদ্বেলিত করবে নিঃসন্দেহে।

মহৎ প্রাণ এই মানুষটির জন্ম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে অবিভক্ত বাংলার বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার ছোট্ট গ্রাম চুরুলিয়ায়। পিতা ফকির আহমেদ ও মাতা জাহেদা খাতুন। অতি দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়ায় শৈশবে তিনি "দুখু মিঞা" নামে পরিচিত ছিলেন। বিভিন্ন স্কুল পরিবর্তন করে শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়াকালীন তিনি স্কুল ত্যাগ করে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। বছর দুয়েক তিনি ৪৯নং বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন। ১৯০২ সালের মার্চ মাসে ৪৯নং বেঙ্গল রেজমেন্টটি ভেঙে দেওয়া হলে রুজি রোজগারের চেষ্টায় নজরুল ফিরে আসেন কলকাতায়। যতদূর জানা যায় "মুক্তি" নামক কবিতাটি ছিল কবির প্রথম কবিতা, যেটি "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়" ছাপা হয়। তবে কবির প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তক "ব্যাথার দান" প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। যদিও সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালীন তাঁর দশটির বেশি লেখা কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়।

পাকাপাকিভাবে কলকাতায় আসার পর ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির পুরোধা ও সাহিত্য প্রেমিক মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গে যুগ্মভাবে 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন ও তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই সময় তিনি রচনা করেন বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'..

আমি সেইদিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতসে
ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেইদিন হবে শান্ত।।

এই বিদ্রোহী কবিতাটি পড়ার পর দেশবাসীর কাছে নজরুল ইসলাম হয়ে উঠলেন বিদ্রোহী কবি ও মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত এক স্বাধীনতা ব্রতী। 'অগ্নিবীনা' পুস্তকে বিদ্রোহী সহ একাধিক কবিতা থাকায় নজরুলকে 'অগ্নিবীনা' ছাপাতেও খুব বেগ পেতে হয়েছিল। অমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন একজন সামান্য ছাপাখানার কর্মী। শুধুমাত্র নজরুলের লেখার ভক্ত হওয়ার কারণে এই বই ছাপানোর সাহস করেছিলেন, যে কারণে অমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাত মাসের কারাদণ্ড হয়েছিল। সরকারী অত্যাচার তিনি হাসিমুখেই মেনে নিয়েছিলেন। আমরা অনেকেই ছাপাখানার এই দরিদ্র মানুষটির কথ জানি না। ১৯২২ সালে নজরুলের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু'। এই পত্রিকায় আনন্দময়ীর আগমনে কবিতাটি উপলক্ষ্য করে ইংরেজ সরকার কবির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। ''আনন্দময়ীর আগমনে''তে নজরুল লিখলেন—

"আর কতকাল থাকবি বেটি, মাটির ঢেলার মূর্ত্তি আড়াল
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল,
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা আসবি কখন সর্বনাশী?"

কবির এই সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ফাগুনের সঙ্গে আগুনও হল। ১৯২৩ সালে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দিন সাতেক কলকাতার জেলে রেখে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল হুগলী জেলে। সেখানে জেলের রাজবন্দীদের উপর ইংরেজ সরকারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে কবি একটানা ৩৯ দিন অনশন করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথঠাকুর তাঁর অনশন ভাঙার জন্য হুগলী জেলে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। সেই সময়েই কবিগুরু তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেন। ১৯২৩ সালে নজরুল কারামুক্ত হন। জেলে বসেই তিনি লিখেছিলেন ''সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'' ও ''শিকল পরার গান''।

১৯২৪ সালে কাজী নজরুল বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ এক হিন্দু মহিলা আশালতা দেবীর সঙ্গে, যাকে বিয়ের পর কবি নামকরণ করেছিলেন 'প্রমীলা' হিসাবে। আশালতা দেবীর মা গিরিবালা দেবীও পুত্রহীন হওয়ার কারণে সাধারণত মেয়ে জামাইয়ের কাছেই থাকতেন। প্রমীলা দেবী সমাজ, আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে কবিকে বিবাহ করে হিন্দু সমাজ ত্যাগ করেছেন—এটা স্বাভাবিক কারণ এটাই প্রেমের অনিবার্যতা। কিন্তু গিরিবালা দেবীর মাতৃস্নেহ—সে কী করে এমন সর্ববাধা বিজয়ী অজেয় শক্তি লাভ করল, নিজ ধর্মের আচার অনুষ্ঠান বজায় রেখে চিরন্তন মানব ধর্মের যে গভীর বিশ্বাস তাঁর হৃদয় চিরজাগ্রত ছিল, যা নজরুলের কবি মানসকে সর্ব সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। আজ থেকে ৯০-৯৫ বছর পূর্বে উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবার পক্ষে যে কতদূর বৈপ্লবিক কর্ম তা বোধহয় আজকের যুগে বসে অনুমান করা কঠিন। কবি নজরুলের ভাবনায় হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির দুই ধারা যে গভীরভাবে মিশে ছিল তা হয়তো গিরিবালা দেবী ও তাঁর বড় জা বিরজাসুন্দরী দেবী যাঁকে নজরুল 'মা' বলতেন, তাদের স্নেহ না পেলে

সুতপা হাজরা

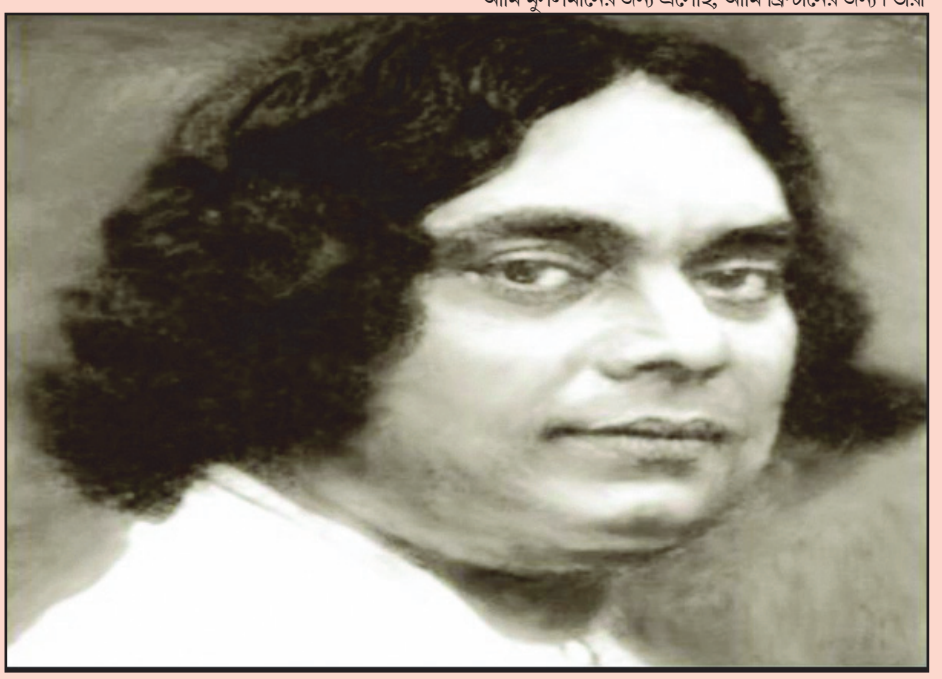

অপূর্ণ থেকে যেত। কবি নজরুল মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন— হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি সৌহার্দ্য আনতে না পারলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন কখনোই দানা বাঁধবে না। নিজের জীবনে নজরুল এই সম্প্রীতির মূল্যবোধ তুলে ধরেছিলেন। বিয়ে করেছিলেন হিন্দু রমনীকে ধর্মান্তরিত না করে। সংসারে কোনোদিন হিন্দু বিধবা শাশুড়ির পূজা-আচ্চা বা আচার আচরণে বাধা দেননি। নিজের চার ছেলের নাম রেখেছিলেন অর্ধেক হিন্দু ও অর্ধেক মুসলমান নামে। পুত্ররা ছিলেন কৃষ্ণ মহম্মদ, অরিন্দম খালেদ, কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ।

১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় দেখা দিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে কবি নজরুল লিখে ফেললেন তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতা 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'—

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরন
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার!
.....
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!

১৯২৬ সালে 'লাঙল' পত্রিকার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর 'লাঙল' নাম বদলে প্রকাশিত হয় 'গণবানী' নামে। এই 'গণবানী' পত্রিকায় কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদের পরামর্শে কবি নজরুল ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। পরে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়ে এটি বিশ্বসঙ্গীতে পরিণত হয়। মুজফ্ফর আহমেদ নিজেই নজরুলের বাংলা অনুবাদটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

"জাগো—
জাগো অনশন বন্দী, উঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকি নিপীড়িত জন-মন-মথিত বানী
নব জনম লভি অভিনব ধরনী
ওরে ঐ আগত।"

ঐ সময়ে গণবানী পত্রিকায় কবি দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'মন্দির মসজিদ' এবং 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধ দুটি থেকে কিছুটা পড়লেই বোঝা যাবে আজও এদের প্রাসঙ্গিকতা কতখানি।

আবার 'হিন্দু-মুসলমানি' কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর মাথা কাটাকাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লা এবং মাকালীর প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য যাহারা মাতাল হইয়া চিৎকার করিতে ছিল, তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল—তখন আর আল্লামিয়ার বা কালীঠাকুরানীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পরিয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে—'বাবা গো মা গো'। দেখিলাম কত আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল। (মন্দির-মসজিদ)

হিন্দুত্ব-মুসলমানত্ব দুইই সওয়া যায়। কিন্তু তাদের টিকিত্ব, দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাঁধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়। ওটা হয়তো পণ্ডিত্ব। তেমনি দাড়িত্ব ইসলামত্ব নয়। ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই 'ত্ব'-মার্কা চুলের গোছা নিয়ে আজ এতচুলোচুলি। আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লার মারামারি—হিন্দু-মুসলমানের মারামারি নয়। নারায়ণের গদা ও আল্লার তলোয়ার কোনোদিন ঠোকাঠুকি বাধাবে না। কারণ তাঁরা দুজনেই এক। তার হাতের অস্ত্র আর এক হাতের ওপর পড়বে না। অবতার পয়গম্বর কেউ বলেননি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি খ্রিস্টানের জন্য। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি—আলোর মতো সকলের জন্য। (হিন্দু-মুসলমান)

চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর জেলবন্দী দশা কবিকে ব্যাথাতুর করেছিল। তিনি তাই লিখেছিলেন 'কারার ঐ লৌহকপাট' কবিতাটি।

'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্তজমাট শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদী।।'

১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার 'অ্যালবার্ট' হলে কবি নজরুল ইসলামকে দেওয়া হয়েছিল নাগরিক সংবর্ধনা। সুভাষচন্দ্র বসু সেই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, ''তাঁর গান পড়ে আমার মতো বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গাইবার ইচ্ছে হতো, আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না, নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়—এটা সত্য কথা... আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব—তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব... কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়—সমগ্র বাঙালি জাতির।" সংবর্ধনা অভিনন্দনের উত্তরে কাজী নজরুল তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, ''বন্ধু আপনারা যে সওগাত হাতে তুলে দিলেন আমি তা মাথায় তুলে নিলুম।... আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেইদিনই করেছেন, যেদিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে। সেই ''ভালো লেগেছে''টা 'ভালো করে' বলতে পারার এই উৎসবে আমার একটি মাত্র করণীয় কাজ আছে। সে হচ্ছে সবিনয় সস্মিত মুখে সশ্রদ্ধ প্রতি নমষ্কার নিবেদন করা। আমাকে 'বিদ্রোহী' বলে খামোখা মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনোদিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে অনেক আচল থেকেই মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি তাতে একটু-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।

.... বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরই অভিযান— সেনাদলের তূর্য-বাদকের একজন আমি—এই হল আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথ যাত্রার পাকে পাকে বাঁকে বাঁকে কুটিল ফণা ভুজঙ্গ, প্রখর-দর্শন শার্দুল পশুরাজের ভ্রূকুটি এবং তাদের নখর দংশনের ক্ষত আজও আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমর পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।.... আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই, আমি সকল দেশের সকল মানুষের।... যৌবনের রক্ত-শিখা-মশাল ধরে অবগুণ্ঠন মোচন করতে চলেছে যে বরযাত্রী, আমি তাদের সহযাত্রী নই বলে যাঁরা অনুযোগ করেন, তাঁরা জানেন না—আমিও আছি তাঁদের দলে, তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে... আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ ভূমিতে তাঁকে দেখেছি। কারাগারের অন্ধকূপে তাকে দেখেছি। ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেবার স্তব স্তুতি।... কেউ বলেন আমার বানী যবন, কেউ বলেন কাফের, আমি বলি, ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি। গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত মেলানো যদি হাতাহাতির চেয়ে অশোভন হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁটছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোনো বেগ পেতে হবে না। কেননা, একজনের হাতে আছে লাঠি, আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি। নজরুল ইসলাম ধর্মের কলঙ্ক, ধর্মভ্রষ্ট, অধর্মাচারী কাফের—এইসব অপবাদ দিয়ে মৌলবাদীরা কবিকে মুসলিম সমাজে বয়কট করার চেষ্টা শুরু থেকে করে আসছিল। নজরুল সংবর্ধনার এই মহতী সভা যেমন বিরুদ্ধপক্ষকে নিস্তেজ করলো, তেমনই নজরুলের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকে দিল যজ্ঞের অপ্রতিহত অশ্বগতি।

১৯৩০-এ কবির প্রিয় পুত্র বুলবুল (অরিন্দম খালেদ)-এর মৃত্যু হয় কঠিন বসন্ত রোগে মাত্র ৪ বছর বয়সে। মুজফ্ফর আহমেদ তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন। পুত্রের মৃত্যু পরবর্তীতে নজরুলকে ভ্রান্তির শিকারে পরিণত করল। বুলবুলের মৃত্যুতে কবি দারুণভাবে ভেঙে পড়েছিলেন, কিন্তু তার লেখনি থেমে থাকেনি। কবির চন্দ্রবিন্দুর বেশিরভাগ গানই লিখেছিলেন ডি. এম লাইব্রেরির এক কোণে বসে। ১৯৩২ সালে ''বুলবুল'' সংগীত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

নজরুল ইসলাম ছিলেন জাতপাত সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে এক মুক্ত পুরুষ। 'জাতের নামে বজ্জাতি' নামে গানটি লিখেছিলেন যে প্রেক্ষাপটে সেটি হল—বহরমপুরে এক বন্ধু পুত্রের বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাওয়ার মুহূর্তে গৃহস্বামী এসে জানায়, নজরুল সেই বিয়েতে উপস্থিত হলে অনেক অভ্যাগতই আসবেন না। এই শুনে কবি অনুষ্ঠান বাড়িতে গেলেনই না এবং লিখে ফেললেন—

'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াত খেলছ জুয়া!
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা দেখে কবি মনেপ্রাণে বুঝতে পেরেছিলেন এর পিছনে ছিল তদানীন্তন সরকারের কারসাজি। মন্দির মসজিদ নিয়ে কোনোরকমে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিতে পারলেই তাদের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যে টান ধরবে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ দেশের বুকে শক্ত করে ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারবে। ''হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ'' কবিতাটিতে সেই আভাস পাওয়া যায়।

''... মূর্চ্ছাতুরের কণ্ঠে শুনে যা জীবনের কোলাহল।
উঠিবে অমৃত, দেরী নাই আর, উঠিয়াছে হলাহল।
থামিস নে তোরা, চালা মন্থন
উঠেছে কাফের উঠেছে যবন।''
উঠিবে এবার সত্য হিন্দু-মুসলিম মহাবল,
জেগেছিস তোরা, জেগেছে বিধাতা, নড়েছে খোদার কল।''

মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও যেমন ইসলামি গান, তেমনি শ্যামাসঙ্গীত—সম্পূর্ণ বিপরীত দুই বিশ্বাসের গানে নজরুলের সৃজনীশক্তির অপরূপতা ছিল বিস্ময়কর। বাংলা ভক্তিগীতি বা ধর্ম সঙ্গীতের ইতিহাসে নজরুলের নতুন অবদান। আর শ্যামাসঙ্গীত—বাংলা শাক্ত পদাবলীর ধারায় রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, উত্তর গীতি প্রবাহে নজরুল অসামান্য মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশের পূর্বে যখন থেকে স্ত্রীর পক্ষাঘাত লক্ষণ দেখা দিল এবং কবি রীতিমতো দেহে মনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, শোনা যায়, তখন তিনি স্বগৃহে কালী সাধনা করতে শুরু করেছিলেন।

''মানুষের ঘৃণা করি
ও কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিতে মরিমরি।''

'মানুষ' কবিতাটি পড়ে বোঝা যায় কবি সব সম্প্রদায়ের মানুষের কথা তুলে ধরতে পেরেছেন তাঁর অগ্নিময় ভাষায়। মুচি, মেথর, চণ্ডাল, চাষী, শ্রমিক সবাইকে কবি মানুষ হিসাবে দেখেছেন। বঞ্চিত মানুষদের অধিকারের এমন দীপ্ত দাবিও বোধহয় শোনা যায়নি আগে। নজরুল প্রায়ই লিখতেন, শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রমিক কৃষকের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রবন্ধ ও কবিতা। অবশ্য তাঁর লেখার মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের থেকে জাতীয়তাবাদই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। নজরুলকে অসাম্প্রদায়িক দেখে মুসলিম মৌলবাদীরা তাঁকে আক্রমণ করে গেছেন ক্রমাগত। যাদের মধ্যে 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠির গোষ্ঠী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কাজী নজরুল ছিলেন অপোষহীন এক ব্যক্তিত্ব। জাতপাত, সম্প্রদায় নিয়ে কোনো কূপমণ্ডুকতাকেই আমল দিতে না। তাই শত সমালোচনা সত্ত্বেও নজরুলকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়নি।

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

সোনার বাংলার সোনালি ৫০

ফিরে দেখা মুক্তিযুদ্ধের সেই ইতিহাস

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস ২৬ মার্চ, ২০২১। ১৯৭১ সালের এই দিনে বিশ্বের মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল একটি ভূখণ্ড—যার নাম বাংলাদেশ। সবুজ জমিতে রক্তিম সূর্য সচিত্রে মানচিত্রের দেশটির স্বাধীনভাবে পথ চলা শুরু। ৫০ বছর আগে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে মুক্তি লাভ করে বাংলাদেশ। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জনই হল একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিঃসন্দেহে বাঙালি জাতির সর্বকালের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। এই মুক্তযুদ্ধ ছিল বাঙালির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি। এই মহান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি বঙ্গবন্ধু নামে খ্যাত।

স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট ঃ ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে ৩১৩টি আসন বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ফলে আওয়ামী লীগই সরকার গঠনের একমাত্র দাবিদার হয়। এদিকে নির্বাচনে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো শেখ মুজিবুরের পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিরোধিতা করেন। তিনি প্রস্তাব করেন পাকিস্তানের দুই প্রদেশের জন্য থাকবে দু'জন ভিন্নপ্রধানমন্ত্রী। সেই থেকেই শুরু হয় বিরোধ।

এর প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তান। নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকার আদায়ের দাবিতে সোচ্চারিত হয়। মুজিবুর রহমান সারা দেশে ধর্মঘটের ডাক দেন। এরপরই ধীরে ধীরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সামরিক বাহিনী নিয়ে এসে বাংলাভাষীদের নিধন শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানে। পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরালো হয়ে ওঠে। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বা ২৬ মার্চ ভোরে চিঠি লিখে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। আত্মপ্রকাশ করেন বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভুটান, সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সমর্থন করে। ভারত আর্থিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সমর্থন জানায়। সেই রাগে পাকিস্তান ভারতে হামলা করলে ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সামিল হয়। মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যৌথ আক্রমণের ফলে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনা ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে।

পাকিস্তান আমলে এই অঞ্চলটাকে পূর্ব পাকিস্তান বলা হতো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর পাকসামরিক শাসকগোষ্ঠীর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে এই অঞ্চলকে 'বাংলাদেশ' বলে অভিহিত করতে শুরু করলেন। 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তাকে তিনি জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এক ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতিতে পরিণত হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। পথ চলা শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ঃ বস্তুত স্বাধীন বাংলাদেশ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ফসল। কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তো হঠাৎ করে শুরু হয়নি। এটি ছিল বাংলাদেশের ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের দীর্ঘকালের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি। আন্দোলনটা ছিল প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদী বা ন্যাশনালিস্ট আন্দোলন। আধুনিক জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক চেতনা থেকে উদ্ভূত। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণের আত্মপরিচয় এবং আশা-আকাঙ্খা ও ভাবনা সম্বন্ধে সম্মিলিত চেতনা হল জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি। এই জাতীয় চেতনা ধর্মভিত্তিক বা গোষ্ঠীভিত্তিক বা সম্প্রদায় ভিত্তিক চেতনা নয়। এটি হল মূলত অসাম্প্রদায়িক বা ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা। একটি ভূখণ্ডের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের আত্মপরিচয়, নিজেদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান সম্পর্কে সম্মিলিত চেতনা থেকে এই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের আগে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এই ধরনের সম্মিলিত চেতনার অভাব ছিল। যেমন এই অঞ্চলের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান বাঙালি হলেও তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় বাঙালির চেয়ে তাদের ধর্মীয় পরিচয় 'মুসলমান'কে বেশি প্রাধান্য দিত। এর পেছনে নানাবিধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ ছিল। প্রাক্ ১৯৪৭ সময়কালে বাঙালি মুসলমানদের অনেকেই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের সঙ্গে

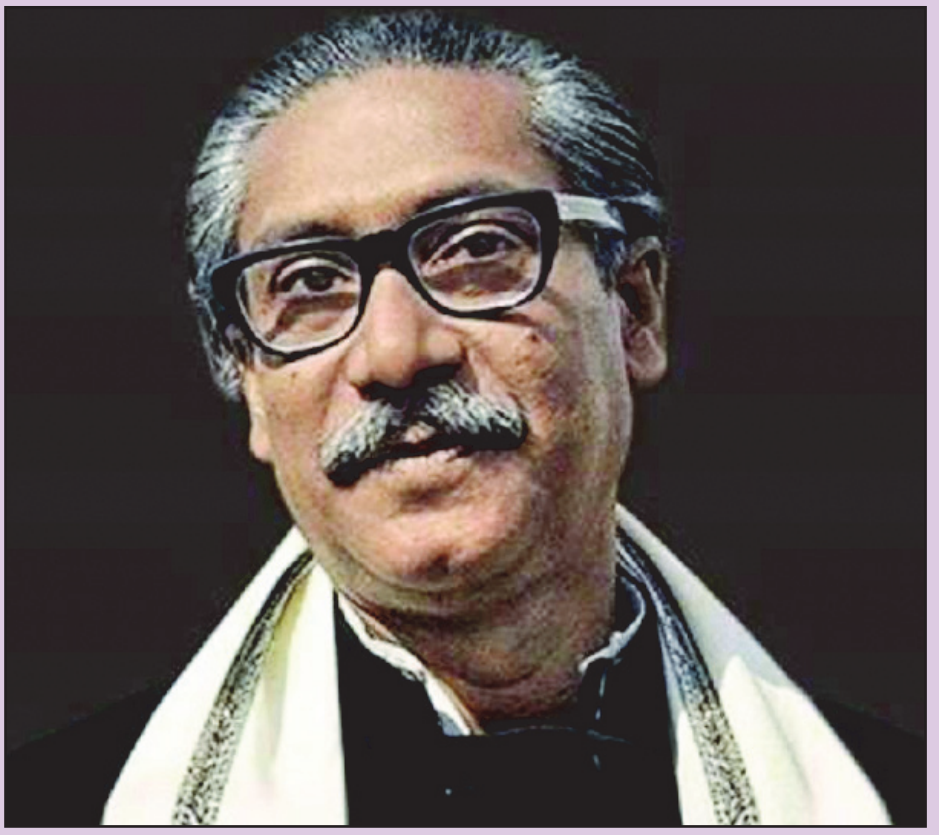

ধর্মীয় চেতনার ভিত্তিতে একাত্ম হয়ে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন করেছিল। মুসলমি লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রচারে প্রভাবিত হয়ে তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, যেহেতু ভারতের মুসলমানরা এক ইসলাম ধর্মাবলম্বী, সুতরাং তারা এক অখণ্ড এবং স্বতন্ত্র জাতি বা নেশন এবং এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। সুতরাং এক স্বতন্ত্র আবাসভূমি বা হোমল্যান্ড অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ হতে পারে।

হিন্দু-মুসলিম দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। এই জন্ম ছিল মূলত মুসলিম লীগের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফসল। কিন্তু এরপরেই দেশটির রাজনীতিতে অভাবনীয় কিছু ঘটনা ঘটে, যার একটি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি মুসলিম লীগের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া।

পাকিস্তানের জন্মের বীজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় ১৯৪১ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে। এই প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের নেতা এবং বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে ফজলুল হক এই প্রস্তাবটি পেশ করেন। পরে এই লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভাজন আরো স্পষ্ট হয়। মুসলিম এলাকায় মুসলিম লীগের প্রার্থী এবং হিন্দু এলাকায় কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হয়।

১৯৪৭ সালের জুন মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সরকার দেশ বিভাগের নীতি মেনে নিয়েছে এবং ১৪ আগস্ট তারা শাসনভার ছেড়ে দিলে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম হয় ভারত ও পাকিস্তানের।

কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই বাঙালি মুসলমানরা ক্রমশ বুঝতে শুরু করে, যে ভিত্তির ওপর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল সেটি ছিল অলীক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিশাল ভারত ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানরা কখনও এক বা হোমোজেনিয়াস জাতি বা সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের থেকে ভাষা ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে একেবারে স্বতন্ত্র। বরং ভাষা ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তারা বাঙালি হিন্দুদের অনেক কাছাকাছি। বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা যে এক অভিন্ন জাতি একথা পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই বাঙালি মুসলমানরা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল।

এই উপলব্ধিকে বলিষ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারণ করেছিলেন ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ তার বিখ্যাত উক্তিতে, ''আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি''। এই ঐতিহাসিক উক্তির মধ্যে নিহিত ছিল বাঙালি জাতিসত্তার মর্মবাণী। এই জাতিসত্তা ছিল অসাম্প্রদায়িক বা ধর্মনিরপেক্ষ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে যখন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে, তখন থেকেই বাঙালিরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এভাবেই শুরু হয় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন।

ভাষা আন্দোলনে রাষ্ট্রের বীজ বপন ঃ পাকিস্তানের জন্মের আগে থেকেই রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার রাজনীতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। এর কেন্দ্রে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত উর্দুভাষী সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বাঙালি কর্মকর্তাদের প্রতি বিরূপ আচরণের অভিযোগ ওঠে। একইরকম মনোভাবের শিকার হন পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তারাও।

পাকিস্তানের গভর্নর মোহম্মদ আলী জিন্না ২৪ মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন; এতে মুসলিম লীগের প্রতি মানুষের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। প্রতিবাদে ঢাকার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিরা বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সব থেকে বেশি ক্ষিপ্ত হয় মধ্যবিত্ত, যে মধ্যবিত্ত রাজনীতিতে সক্রিয় ছিল। তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরিত হওয়ার আশঙ্কায় রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়।

মোহম্মদ আলী জিন্নার মৃত্যুর পরও রাষ্ট্রভাষা নিয়ে নানারকম প্রস্তাব পাল্টা প্রস্তাব চলতে থাকে। দেশভাগের পর থেকে ১৯৫২ সালের শুরু পর্যন্ত বাঙালিরা জোরালোভাবে রাষ্ট্রভাষা উর্দু সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধ মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকে। তবে এই আন্দোলন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অগ্নি স্ফুলিঙ্গের জন্ম হয়, যখন ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের এ্যাসেম্বলিতে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। ২৭ জানুয়ারি খাজা নজিমুদ্দিন ঢাকা সফরে এসে জিন্নার কথাই পুনরাবৃত্তি করেন। তার ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মনে বঞ্চনার অনুভূতি আরও জোরালো হয়ে ওঠে। শুরু হয় স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল, যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

ভাসানীর নেতৃত্বে সম্মেলনে অংশ নেন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সংস্কৃতকর্মী এবং পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মানুষে। ২১ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট প্রতিহত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। একে উপেক্ষা করে আন্দোলন চললে পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বর এবং শফিউর ছাড়াও আরো অনেকে শহীদ হন। এই হত্যাকাণ্ড মাতৃভাষার অধিকারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে দাবিয়ে দিতে পারেনি। এই আন্দোলনেই পরিষ্কার হয়েছিল যে দু'হাজার কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি ভূখণ্ডের দুটি ভিন্ন ভাষার জাতিসত্তাকে মিলিয়ে সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মনে এক হওয়ার অনুভূতি জাগ্রত হতে পারে না। মাতৃভাষা নিয়ে এই আন্দোলনেই বীজ বপন হয়েছিল পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের।

ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে যে নতুন ধর্মনিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয় তার প্রতিফলন ঘটে বাংলাদেশে। তখন থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি ধর্মনিরপেক্ষ ধারায় প্রভাবিত হতে শুরু করে। মুসলিম লীগ ভেঙে গিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। পরে এটি আওয়ামী লীগ নাম ধারন করে বাংলাদেশের সবচেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু বাংলাদেশের ভেতরেই বেশ কিছু সংখ্যক লোক ছিল যারা দেশের স্বাধীনতা চায়নি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তানের অনুচর হিসেবে কাজ করতে দ্বিধা করেনি। তারা সুপরিকল্পিত ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি গোষ্ঠী—যারা পাকিস্তান ভাবাপন্ন ছিল তারাও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই ষড়যন্ত্রের ফলেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন। সে বছরেই বঙ্গবন্ধু চারজন ঘনিষ্ঠ সহচর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মেজর জেনারেল জিয়াউল রহমান নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তাঁর হত্যাকাণ্ড এবং তার অল্পকাল পরেই জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন চলে বাংলাদেশের স্বাধীন সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের গোটা ইতিহাসকে বিকৃত করে দেশের সাধারণ মানুষের অবদানকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। কিন্তু ইতিহাসের চাকাকে তো কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর খেয়াল-খুশিমতো উল্টে দেওয়া যায় না। দীর্ঘ একুশ বছর পর বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

বর্তমান বাস্তবতা ঃ বর্তমানে পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের যুগে প্রয়োজন হয় না যুদ্ধের, প্রয়োজন হয় না দেশভাগের। ইতিহাসকে বিকৃত করে রক্তপাতহীন আগ্রাসন চালাতে স্রেফ কলমের খোচায় কেড়ে নেওয়া যায় নাগরিকত্বের অধিকার। তকমা লাগিয়ে দেওয়া যায় অনুপ্রবেশকারী বলে। আজকের বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তা ছিল বঙ্গপ্রদেশ। লর্ডকার্জনের তৎপরতায় ১৯০৫-এর পর তা দাঁড়ায় আসাম ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশ। আবার ১৯৪৭-এর পর তার থেকে সৃষ্টি হয় পূর্ব পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সালের পর জন্ম হয় বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির। অর্থাৎ ব্রিটিশ পিরিয়ডে যা ছিল 'Migration issue of Poor Peasants from Bengal & East Bengal towards Assam' সেটাই হয়ে দাঁড়ায় 'foreigner issue'।

নাগরিকত্বের বিশুদ্ধতার ধুঁয়ো তুলে মানুষকে xenophobia-য় আক্রান্ত করা হচ্ছে। এটা শুধু একটা অঙ্গ রাজ্যের বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা সংক্রামক। পরিচিতি সত্তার রাজনীতির এটা একটা রূপ যা দিয়ে মানুষের সামগ্রিক জীবন-জীবিকার আন্দোলন, অর্থনৈতিক ভারসাম্যের আন্দোলন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, কর্মসংস্থানের আন্দোলন, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখার চক্রান্ত করা হয়। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শানিত চেতনা দিয়েই এই চক্রান্তকে রুখে দেওয়ার দায়িত্ব বাংলাদেশবাসীর। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে আমাদেরও এই দায়িত্ব বর্তায়। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

কেন্দ্রীয় রক্তদান কর্মসূচী

জন্য নয়, কোভিড পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের হাতে খাদ্য শস্য সহ ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্য কর্মীদের সাহায্য সহযোগিতার প্রশ্নে যে সমস্ত প্রগতিশীল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে সংগঠনগতভাবে তাদেরও পাশে থাকার জন্য।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান আমরা যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছি সেই কোভিড-১৯-এর

রক্তদান কর্মসূচীতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

সূচনায় একে প্রতিরোধ করায় কোনো অস্ত্র স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে ছিল না। অপরদিকে রাষ্ট্র বলেছিল থালা বাজিয়ে, মোমবাতি জ্বালিয়ে, আলো নিভিয়ে আমরা ২১ দিনে এই করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিতে যাব। মহাভারতের যুদ্ধের থেকে ঠিক তিনদিন বেশি লাগবে। কিন্তু বাস্তবে সবাই দেখলাম, মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন চিকিৎসা, অক্সিজেন, বেড-এর জন্য হাহাকার চলছে। আই সি ইউ নেই— এমনকি বহু বিদগ্ধ মানুষও বেড জোগাড় করতে পারেননি। হাসপাতালগুলিতে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ২৫-৩০ জন মানুষ একট মাত্র নল থেকে একের পর এক অক্সিজেন নিচ্ছেন, শেষজন জানেনও না তিনি আদৌ নলটি থেকে বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন পাবেন কিনা। এই অবস্থায় আক্রমণ হয়েছে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর। কিন্তু বহু শুভানুধ্যায়ী মানুষ-সংগঠন পাশে দাঁড়িয়েছে এই পরিস্থিতিতে সরকারের দায়িত্ব পালন করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি, রেড ভলান্টিয়ার্সরা। রাষ্ট্র বা রাজ্যের থেকেও বহু ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যাও দেখা দেয় স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র কোভিড নিয়েই ভাবতে গিয়ে অন্যান্য রোগীদের ক্ষেত্রে কোনো ভাবনা ছিল না। ফলস্বরূপ অসংখ্য মানুষ যাদের কেমোথেরাপি, ডায়ালিসিসের দরকার ছিল বা Sugar-এর রোগী এদেরকে আমরা হারালাম। কোভিড শুধু প্রাণ নয়, মানুষের রুটি-রজি কেড়ে নিয়েছে, শিশুদের শৈশব কেড়ে নিয়েছে। আমাদের সংগঠন সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিল স্কুল খোলার জন্য, শুধু মাত্র চাল-ডাল নয়, পরিবারপিছু ৭৫০০ টাকা সাহায্যে জন্য। কোভিডকে কেন্দ্র করে যে বিপুল ব্যবসা এ সময়ে হয়েছে তা আর কোনো ক্ষেত্রে হয়নি। এর সঙ্গে চলেছে ওষুধের কালোবাজারী, মানুষ ওষুধের জন্য ঘুরছেন কিন্তু কিনতে পারছেন না। আমরা ইতিপূর্বে জানতাম কোনো কোনো কঠিন রোগের চিকিৎসায় শেষপর্যন্ত ঘটি-বাটি বেচে দিতে হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল মানুষ আগেই ঘটি-বাটি বেচে চিকিৎসা কিনতে বাধ্য হলেন। বহু মানুষ বাড়িতেই মারা গেলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পাশে রাজ্য বা রাষ্ট্র কেউই দাঁড়ায়নি। কোভিড মোকাবিলায় অন্যতম অস্ত্র Break the Chain। সরকারীভাবে যা বাড়ছে তা প্রকৃত তথ্য নয়। 30%-40% কোভিড সংক্রমিত হয়ে গেছেন ইতিমধ্যে। বিনামূল্যে গণটিকাকরণের দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে নিতে হবে। প্রয়োজন হার্ড ইমিউনিটি। আবিষ্কৃত টিকাও বিদেশে চলে যাচ্ছে। টিকা নিয়ে স্বজনপোষন, দুর্নীতি চলছে। গণটিকাকরণ করতেই হবে এই দাবিতে আন্দোলনেও আমাদের সামিল হতে হবে। যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের অচ্ছুৎ করা চলবে না, তাদের সাহায্য করতে হবে। মানুষের যদি মানুষের পাশে না দাঁড়ায়, তাহলে এই পরিস্থিতিকে আমরা জয় করতে পারব না।

সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য। ৭জন মহিসাসহ সর্বমোট ৮০ জন রক্তদাতা রক্তদান করতে পারেন। অনেকে ইচ্ছা থাকলেও পর্যাপ্ত কিটের অভাবে রক্তদান করতে পারেননি। রক্তদান চলাকালীন এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি এক মুমূর্ষু রোগীর প্রয়োজনে একজন রক্তদাতা কর্মচারী ভবন থেকে উক্ত হাসপাতালে গিয়ে রক্তদান করেন।

এদিন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি এবং উত্তর-দিনাজপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকেও রক্তদান কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলায় ৬০ এবং উত্তর দিনাজপুরে ১৬ জন্য রক্ত দান করেন। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

১৫ জুলাই সারা ভারতপ্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচী

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ সহ চার দফা দাবিতে আহূত প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা কলকাতার ৭টি অঞ্চলের কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন। মহাকরণ অঞ্চলের কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার কালেক্টরেট বিল্ডিং-এ। এই কর্মসূচীতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। নবমহাকরণ অঞ্চলের কর্মসূচীতে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক দেবব্রত রায়। মধ্যাঞ্চলের কর্মসূচীতে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য প্রণব কুমার কর। পূর্বাঞ্চলের কর্মসূচীতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য। উত্তরাঞ্চলের কর্মসূচীতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়। লবণহ্রদ অঞ্চলের বিক্ষোভ কর্মসূচীতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। দক্ষিণাঞ্চলের কেন্দ্রীয় কর্মসূচী দুটি ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। একটি ভবানী ভবনে। সেখানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দেবাশীষ মিত্র, অপরটি পি এস সি বিল্ডিংয়ে। সেখানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দেবাশীষ মিত্র। বক্তারা সকলেই ৪ দফা দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন সকলকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দিতে হবে। এই দাবি বামপন্থীরাই প্রথম জানায়। বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি এই দাবিতে সর্বোচ্চ আদালতেরও শরণাপন্ন হয়। আমরাও সংগঠনগতভাবে রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং দেশের ক্ষেত্রে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন সরকারের কাছে এই দাবি জানিয়েছি এবং যতক্ষণ না এই দাবি পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের লড়াইতে সামিল থাকতে হবে। দপ্তরগুলিতে প্রতিদিন কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের মধ্য দিয়ে শূন্য পদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে চুক্তিপ্রথায় কর্মচারী নিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা সংগঠনগতভাবে ধারাবাহিকভাবে এই দাবি জানাচ্ছি যে, শূন্যপদে স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। বকেয়া মহার্ঘভাতার ক্ষেত্রে রাজ্য প্রশাসনে কর্মচারীদের বঞ্চনা পাহাড় প্রমাণ। এর বিরুদ্ধে আমাদের সংগঠন ধারাবাহিক প্রতিবাদ কর্মসূচী প্রতিপালন করে চলেছে। এই কর্মসূচী প্রতিপালন করতে নবান্নে গিয়ে শুধুমাত্র স্লোগান সাউটিং করার কারণে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের গ্রেপ্তার এবং পরবর্তীতে সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদকসহ ১৫ জন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যকে দূরদূরান্তে বদলী করা হয়। এছাড়া এসময়কালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বহু কর্মী-নেতৃত্বকে তাদের বাসস্থান থেকে বহু দূরবর্তী স্থানে বদলী করা হয়েছে কোনো নিয়মনীতি না মেনে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এই নীতিহীন ও প্রতিহিংসামূলক দলীয় আদেশনামা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে। একই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণের অপপ্রয়াস বন্ধ করা এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির তার জন্মলগ্ন থেকেই কর্মচারীদের ওপর প্রশাসনিক আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইতে সামিল থেকেছে এবং আগামীদিনেও কর্মচারীস্বার্থে এ লড়াই অব্যাহত থাকবে। □

দেবাশীষ রায়

চার পৃষ্ঠার পরে

নজরুল—কালান্তরের জাগ্রত প্রতিনিধি

কম বেশি সকলেরই প্রায় জানা আছে নজরুলের কলম থেকে বেরিয়েছে বিদ্রোহের কবিতা, প্রেমের কবিতা, কিষাণ ও শ্রমিক নিয়ে কবিতা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবিতা, জাতপাতের বিরুদ্ধে কবিতা, পরাধীনতার বিরুদ্ধে কবিতা, শ্যামাসঙ্গীত ও নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ গান। এছাড়াও নজরুল লিখেছেন বহু প্রবন্ধ, শিশুদের জন্য কবিতা, নাটক ও গান। লিখেছেন বহু গল্প, রাজনৈতিক রচনাবলী ও উপন্যাস। লিখেছেন গীতিনাট্য ও বহু পুস্তক-পুস্তিকা। রাজরোষে পড়ে বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধের তালিকায় এসেছিল অগ্নিবীনা, সর্বহারা, ফনিমনসা ও সঞ্চিতা। এছাড়া প্রবন্ধ গ্রন্থ 'রুদ্রমঙ্গল' ও উপন্যাস 'কুহেলিকা'। 'প্রলয় শিখা'র জন্য শুধু লেখক নজরুল নন, অভিযুক্ত হতে হয়েছিল বর্মন পাবলিশিং হাউসের ব্রজবিহারী বর্মনকেও। কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন ছিল খুবই স্বল্পমেয়াদের—সর্বসাকুল্যে কুড়ি থেকে বাইশ বছর। দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা কবির অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসত। 'ব্যাথার দান' গল্পে কবি লিখেছেন, "... মাকে হারিয়েছি বলেই—মাতৃস্নেহের ঐ মস্ত শিকলটা আপনা হতে ছিঁড়ে গিয়েছে বলেই আজ মা'র চেয়েও মহীয়সী আমার জন্মভূমিকে চিনতে পেরেছি"। নজরুল যাদের নিয়ে গল্প লিখতেন তাদের চলতি ভাষাই গল্পে ব্যবহার করার চেষ্টা করতেন। বীরভূমের বাগ্দীদের ভাষায় 'রাক্ষুসী' গল্পটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে ক্রীশ্চান আর মুসলমান মেয়েদের জাত নিয়ে ঝগড়ার দৃশ্যটির কথোপকথনও ভুলে যাওয়ার নয়। কিশোর-কিশোরীদের জন্য "হিন্দু মুসলমান" কবিতাটি এবং শিশুদের জন্য 'ঝিঙে ফুল', 'ভোরের পাখী' ও 'পুতুলের বিয়ে' পুস্তকগুলিও উল্লেখের দাবি রাখে। বহু পুরস্কারে কবি ভূষিত হয়েছেন—যেমন ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মভূষণ (১৯৬০), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জগত্তারিনী' (১৯৪৫), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট (১৯৬৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লিট (১৯৭৩), বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার "একুশে পদক" (১৯৭৫)। তবে এই পুরস্কারগুলি কবি সজ্ঞানে গ্রহণ করতে পারেননি—কারণ ১৯৪২ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কবির জীবন কেটেছে বাক্সম্পদবর্জিত অসহায়তায়, পরে হতবুদ্ধি ও স্মৃতিবর্জিত দৈন্যে, রাষ্ট্রীয় অনুগ্রহের ভরসায়, বদান্যতার প্রহসনে ও দেশি বিদেশী বহু চিকিৎসকের ব্যর্থ সুশ্রূসায়।

শেষ জীবনে ১৯৭৫ সালের ২২ জুলাই কবির শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে ঢাকার সরকারী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট কবি নজরুল ইসলামের জীবনাবসান হয়। প্রায় তিন দশক ধরে বাহ্যজ্ঞানরহিত স্থবির মানুষটির মৃত্যুতে যেন প্রমাণ হয় এতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর মরদেহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতো এমন সাম্যের মানুষ, এমন অসাম্প্রদায়িক মানুষ, এমন মানুষের মতো মানুষ, এমন বড় মনের মানুষ সাহিত্যের আঙিনায় খুব কমই দেখা গিয়েছে। যে কবি ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীত অনুবাদ করেন বাংলায়, যিনি অনুবাদ করেন পৃথিবীর লাঞ্ছিত মানুষের 'রক্ত পতাকার গান' অথবা 'জাগর সূর্যে'র মতো আন্তর্জাতিক কবিতা—তিনি কি কোনো বিশেষকালের অথবা সময়ের কবি হিসাবে বেঁচে থাকবেন? না কি পৃথিবীর সকল প্রান্তে যেখানে শোষণ ও অত্যাচার, লাঞ্ছনা আর ঔপনিবেশিকতার পীড়ন সেখানে নজরুলের সৃষ্টি, তাঁর উজ্জীবনী শেকল ভাঙার গানই হয়ে উঠবে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের কালোত্তর মর্মবাণী। কালোত্তর কি না তা সমকাল বিচার করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু শতবর্ষ পার করেও যখন কোনো কবির সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা বা তর্ক-বিতর্ক, প্রয়োজন অথবা প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন ওঠে, যখন নজরুলের কবিতা ও গান, প্রবন্ধ বা অন্যান্য রচনা হয়ে ওঠে জীবনের নিত্য-সহচর, তখন তিনি আমাদের অলক্ষেই হয়ে পড়েন মানুষের পথ চলার সঙ্গী, প্রেরণার প্রাত্যহিক অনুভূতির প্রধান উৎস। কাল তাঁকে তখন অলক্ষেই বরণ করে নেয়। ঠিক সেই নিয়মেই নজরুল হয়ে উঠেছেন কালান্তরের জাগ্রত প্রতিনিধি। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ

Act, MISA, POTA, TADA ইত্যাদি। বিনা বিচারে প্রতিবাদী কণ্ঠকে আটকে রাখার ফন্দি প্রশাসন বার করেছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে ধীরে ধীরে অনেকগুলিই বাতিল হয়েছে।

UAPA বা আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট প্রথম লাঘু হয় ১৯৬৭ সালে। জাতীয় ইন্টিগ্রেশন কাউন্সিলের সুপারিশে ১৬তম সংশোধনীতে এটি কার্যকরী হয়। এর মধ্য দিয়ে মূলত তিনটি মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার কথা বলা হয়। বাক্ স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশ, শান্তিপূর্ণ জমায়েতের স্বাধীনতা এবং ইউনিয়ন / অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ সংগঠন করার অধিকার। এরপর আরও তিনবার এই আইন সংশোধিত হয়েছে (২০০৪, ২০১৩ এবং ২০১৯)। সর্বশেষ সংশোধনী ২০১৯-এ। বর্তমানে এই আইনে যে কোনো সংগঠন বা ব্যক্তিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দায়ে অভিযুক্ত করা যায় এবং এর মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তির যাবতীয় সামাজিক অধিকার হরণ করা যায়। এই আইনে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি যে কোনো নাগরিককে জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে গোটা দেশের যে কোনো রাজ্য থেকে গ্রেপ্তার করতে পারে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অনুমতি ব্যতিরেকে এবং ষাট থেকে নব্বই দিন পর্যন্ত বিনা চার্জশিটে বন্দী রাখতে পারে। এরপরেও হেফাজতের মেয়াদ একশো আশি দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে। এই আইনে একটি অদ্ভুত বিধান আছে। অভিযুক্তকেই প্রাথমিকভাবে প্রমাণ করতে হয় যে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগটি সঠিক নয়। অভিযুক্তের উপর অভিযোগ অসত্য বা বেঠিক প্রমাণ করার দায় সাধারণ আইনি বা বিচার ব্যবস্থার বিরোধী। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সুপ্রিম কোর্ট এই আইনকে বৈধতা দিয়েছে।

এই আইনের প্যাঁচে ফেলে প্রায় ৩৮টি সংগঠনকে টেররিস্ট সংগঠনের তকমা দেওয়া হয়েছে। শাহীনবাগে শান্তিপূর্ণ CAA, NRC বিরোধী আন্দোলনকে দমন করতে প্রয়োগ করা হয় এই আইন। গ্রেপ্তার করা হয় উমর খালিদ, ফাফুরা জারগার সহ অনেককে। উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের নারকীয় ঘটনা কভার করার জন্য সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অভিযোগে এই আইনের মারফৎ।

UAPA-এর পাশাপাশি আছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বা NSA। এই আইনে সর্বাধিক বারো মাসের জন্য হেফাজতে নেওয়া যায় মূলত জেলাশাসক বা পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে জানিয়ে। উত্তরপ্রদেশে ডা. কাফিল খানকে গ্রেপ্তার করা হয় আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে রাজ্য সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য। এই NSA-কে ব্যবহার করে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পর তারিগামী, ফারুক আবদুল্লা, ওমর আবদুল্লা, এম. এম. সঈদ সহ বহু রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই ধরনের দমনমূলক আইনে অভিযুক্তের বিচারের ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থাও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। ফাদার স্ট্যান স্বামীকে যখন বিচারকদের কাছে উপস্থিত করা হয়, তখন নিঃসন্দেহে বিচারকরা তাঁদের স্বাধীন আইন সঙ্গত মতামত প্রয়োগ করেননি। আইনে যেসব নির্দিষ্ট অপরাধের কথা বলা আছে, সূক্ষ্ম বিচারে একটি ঘটনাও যা আইনে উল্লেখিত তা ফাদার স্ট্যান স্বামীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না। পার্কিনসন্ রোগে আক্রান্ত হবার কারণে তিনি আদালতের কাছে বিশেষ সুবিধা (একটি স্ট্র) চেয়েছিলেন। সেই বিচারপতি নিজস্ব মতামত দেওয়ার বদলে পুলিশকে তিন সপ্তাহ সময় দিয়েছিলেন স্ট্র দেওয়া হবে কিনা তা খতিয়ে দেখতে। বিচারপতিদের এই অসংবেদনশীলতা সাংবিধানিক মূল্যবোধের বিরোধী। স্ট্যান স্বামীর জামিনের আবেদন বারংবার খারিজের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ মেলে না। শুধুমাত্র পুলিশের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বিবেচনা করাটা বিচারকদের কাজ নয়।

রাজনৈতিক স্বার্থে যে UAPA ধারা দেওয়া হয়, তার অন্যতম দৃষ্টান্ত আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। দার্জিলিংয়ে বিনয় তামাঙ, বিমল গুরুঙ সকলের বিরুদ্ধে UAPA লাগানো হয়েছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিনয় তামাঙ ও বিমল গুরুঙ উভয়কে নিয়েই চলছেন। অর্থাৎ UAPA ধারাগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার নিছকই রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে চলেছে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই নাগরিক মননে প্রশ্ন জোরালো হচ্ছে, প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা আর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ-এর পার্থক্য কি নেই? অবিবেচক শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মানেই রাষ্ট্রবিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ন্যায় বিচারের পক্ষে কণ্ঠ আরও জোরালো করতে হবে। □

শতবর্ষের আলোকে কমরেড সুশীল দাস

বাণী প্রসাদ ব্যানার্জী

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, সংগঠক ও প্রকৃত অর্থে নেতা এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনপর্বে ঐতিহাসিক দায়িত্বপালনকারী অন্যতম সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড সুশীল কুমার দাসের জন্মশতবর্ষ বর্তমান বছরে। ১৯২১ সালে অধুনা পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা নিশিকান্ত দাস খুলনা জমিদারের নায়েব ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। অত্যান্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। খুলনার ব্রজলাল হিন্দু এ্যাকাডেমী (বর্তমানে ব্রজলাল গভঃ কলেজ) থেকে বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক হন। উদ্যমী সুশীল দাস গ্রামে গড়ে তুলেছিলেন কিশোর বাহিনী, গ্রামের ছেলেদের যুক্ত করে গড়েছেন তরুণ সঙ্ঘ। ছাত্রাবস্থায় ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় সদস্য, অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং সাম্যবাদের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। অজ পাড়াগাঁয়ের উন্নতি সাধন, রাস্তা তৈরি এবং সমবয়সীদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। যা বর্তমানে ধামুরা বহুমুখী বিদ্যালয় হিসাবে পরিচিত। ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে করতে স্বপ্ন দেখেছিলেন বিদ্যালয়টি উন্নীত হবে মাধ্যমিক স্তরে। সাংসারিক প্রয়োজনে বরিশাল কালেক্টরেটে চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অচিরেই জানতে পারেন তার রাজনৈতিক সত্তার পরিচয় এবং ফলশ্রুতিতে ১৯৪৪ সালে চাকুরীচ্যুত হন। পুনরায় নিজের গড়া বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যুক্ত হন। বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন। ১৯৪৫ সালে মহিলা আন্দোলনের নেত্রী কমলা দাসকে বিবাহ করেন। এদিকে রাজনীতির পরিমণ্ডলে তখন প্রচণ্ড অস্থিরতা। ১৯৪৬-এর ভয়াবহ দাঙ্গার পরিস্থিতিতে স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। অন্যদিকে তার বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে আসা পরিদর্শকেরা স্কুলের পরিকাঠামো ও প্রধান শিক্ষকের যোগ্যতা দেখে স্কুলটিকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেন। ভাতৃঘাতী দাঙ্গা আর ভারত বিভাজনের মধ্য দিয়ে এল স্বাধীনতা। বঙ্গপ্রদেশ দুটি ভাগে বিভাজিত হল। সুশীল দাস বিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এলেন স্ত্রী ও কন্যাকে ফেরৎ নিয়ে যাওয়ার জন্য। এসেই শুভানুধ্যায়ীদের থেকে খবর পেলেন তিনি যাতে ধামুরামুখী না হন, পুলিশ জানিয়ে গিয়েছে কমিউনিস্ট সুশীল দাস ফেরৎ এলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। আর ফেরা হল না। লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো তিনিও হলেন ছিন্নমূল উদ্বাস্তু। প্রথমে মুরারীপুকুরে একটি পরিত্যক্ত বাগানবাড়ি ও পরে বেলেঘাটা-বাগমারী অঞ্চলে বাসস্থান তৈরি করলেন। শুরু হল আর এক কঠিন জীবন সংগ্রাম।

প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে কাটালেও যোগাযোগ রেখেছেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে। ১৯৪৮ সালে অস্থায়ীভাবে চাকরি পেলেন কারা অধিকারে। ১৯৫১ সালে সংবিধান স্বীকৃত নবগঠিত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সচিবালয়ের সমবায় বিভাগে যোগদান করেন। ঐ একই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়, নিতাইহরি কর মজুমদার সহ বেশ কিছু সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখা যুবক। এদের মধ্যে সুশীল দাস বয়ঃজ্যেষ্ঠ। শুরু হল পথ চলা। তখন সংগঠন করার অধিকার ছিল না। নিভৃতে চলতে লাগল প্রস্তুতি, সলতে পাকানোর কাজ। ১৯৫২ সালে সংবিধানে সংগঠন করার অধিকার পাওয়া মাত্র নবপর্যায়ে সরকারী কর্মচারীদের সমস্ত সংগঠনগুলির পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হল। নবপর্যায়ে, পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনও পুনর্গঠিত হয়ে কর্মচারীদের একত্রিত করেদাবি আদায়ের সংগ্রামের পথে নেমে পড়ল। এই পর্বে নেতৃত্ব দিয়েছেন অজয় মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, সুশীল দাস, নিতাই হরি কর মজুমদার সহ আরো অনেক সাহসী নেতা-কর্মী-সংগঠকেরা। সুশীল দাস এই সংগঠনের ১৯৬৫-৬৭ সাল পর্যন্ত যুগ্ম সম্পাদক ও ১৯৬৮-১৯৭৭ পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। কর্মচারী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠল মহাকরণ আর মহাকরণ ক্যান্টিন হল। ১৯৫৫-৫৬ সাল পশ্চিমবেঙ্গ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, কর্মচারী আন্দোলন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এক বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে ওয়েলিংটন স্কোয়ার বর্তমানে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বাসভবনের সামনে ঐতিহাসিক মিছিল ও সমাবেশ সংগঠিত করা হয়েছিল। এই মিছিলের তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। এই সমাবেশের পরেই গঠিত হয় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ মঞ্চ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সুশীল দাস ছিলেন এর অন্যতম রূপকার। তিনি এই সংগঠন পরিচালনার সর্বোচ্চ নেতৃত্বে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও এই রাজ্যের কর্মচারীদের যৌথ আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ সেনানী ছিলেন। তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির

মহাকরণ অঞ্চলের প্রথম আহ্বায়ক ও পরে সম্পাদক ছিলেন।

সংগঠন করার অপরাধে তিনি অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রশাসনিক বহু আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিলেন। কখনও তিনি বিচলিত হননি। ১৯৭০ সালে তিনদিনের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের পরে শাসক শ্রেণী কর্মচারী ঐক্য ভাঙার জন্য বেছে নিয়েছিল চরমপন্থা। ১৯৭১ সালে রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতাবলে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠনের ১১ জন শীর্ষ নেতাকে সরাসরি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এবং এদের রাইটার্সে ঢোকার অনুমতি কেড়ে নেওয়া হয়। ঐ সময়, কর্মী-সংগঠক-আণ্ডয়ান কর্মচারী সমাজ যাতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে না পড়েন, সেইজন্য সুশীল দাসের নেতৃত্বে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অসামান্য দৃঢ়, সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিংস ভিত্তিক সমিতিগুলিকে আরো আন্দোলনমুখী চেতনায় তারা শাণিত করেছিলেন, যা সারা রাজ্যের কর্মচারী আন্দোলনে ইতিবাচক উপাদান সংযোজন করেছিল। এই সময়ে সারা ভারতবর্ষে গড়ে উঠছে বিভিন্ন সংগ্রাম। আকাশে-বাতাসে বারুদের গন্ধ। এরই পটভূমিতে নেমে এল ১৯৭৫ সালে জুন মাসে জারী হল অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা। সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হল। সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল। পরবর্তীতে কালা আইন মিসায় গ্রেপ্তার করা হয় সুশীল দাস সহ এই রাজ্যের ১৪ জন সরকারী কর্মচারী নেতা-সংগঠককে এবং জেলের অভ্যন্তরে রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতাবলে সংবিধানের ৩১১(২)(গ) ধারায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে সরাসরি বরখাস্ত করা হয়। কমরেড সুশীল দাসও চাকুরিচ্যুত হয়েছিলেন। এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্বকেও কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কারাবাসে থাকার সময়েও সুশীল দাস তার মতাদর্শের প্রতি গভীর আনুগত্য ও মানসিকতার দৃঢ় পরিচয় দিয়েছিলেন। সমস্ত কারারুদ্ধ কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করতেন এই বলে যে এই কাল রাত বেশিদিন স্থায়ী হবে না, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবেই। ১৯৭৭ সালে প্রথমে কেন্দ্রে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার-জনতা দলের সরকার গঠিত হয়। অব্যবহিত পরে এই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। এই সরকার তার প্রথম ক্যাবিনেট সভায় সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি ঘোষণা করে এবং চাকুরীচ্যুত সকল কর্মচারীদের চাকুরীতে পুনর্বহাল করে। ১৯৭১ সাল থেকে বরখাস্ত সকল কর্মচারী পুনর্বহাল হন। শুরু হয় এক নতুন দিনের যাত্রাপথ।

সুশীল দাস শুধুমাত্র মতাদর্শ রাজনীতি, সংগ্রাম, সংগঠনের আয়ুধে শক্তিশালী ছিলেন না। ছিলেন এই বিষয়গুলির উপর একজন শিক্ষক ও লেখক। তিনি গভীরভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন, পড়তেন একজন ছাত্রের মানসিকতা নিয়ে। তাই তার লেখনী ছিল অত্যন্ত সহজ সরল। ১৯৮১ সালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সংগ্রামী হাতিয়ারের বিশেষ সংখ্যায় এবং সংগঠনের চতুর্দশ সম্মেলনের প্রাক্কালে ২০০৪ সালে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের সূত্রপাত থেকে সংগঠন-আন্দোলনের বিকাশধারার ইতিহাস ধর্মী যে দুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল আজও তা প্রাসঙ্গিক এবং সবার কাছে তা শিক্ষনীয়। লালদীঘির বহু সংখ্যায় তার শিক্ষণীয়-মনোগ্রাহী লেখা আছে। উৎসাহীরা পড়তে পারেন। সুশীল দাস শুধুমাত্র সংগঠক বা নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রশাসনের একজন দক্ষ কর্মচারী। বহু বিষয়ে আধিকারিকরা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

সুশীল দাস চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে। কিন্তু সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। অবসর গ্রহণের পরে নিয়মিত আসতেন সমিতি দপ্তরে, ১৮৬ নং বিপিন বিহার গাঙ্গুলী স্ট্রীটের সেই ঐতিহাসিক বাড়িতে। ১৯৮৮ সালে কো-অর্ডিনেশন কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মুখ্যত নরেন গুপ্তের উদ্যোগে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি। এই সংগঠনের গঠনপর্ব থেকে সুশীল দাস এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিতে ও তাকে বিকশিত করার জন্য আমৃত্যু সচেষ্ট থেকেছেন। ১৯৯৩ সালে দূরারোগ্য ক্যান্সার আক্রান্ত তাঁর গলগণ্ডে একটি বড় অস্ত্রোপচারের পর তিনি বিশ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এই অস্ত্রোপচার বা কথা বলতে অসুবিধা হওয়া, কোনোটাই তাকে সংগঠনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। যতটা পেরেছেন সংগঠনের কাজ করেছেন। শেষদিকে বয়সজনিত কারণে বাইরে বেরোতে পারতেন না। টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতেন, কথা বলা বারণ, তাও চেষ্ট করে গিয়েছেন। একবারের জন্য মনুষ্যজীবন, তাকে সার্থকভাবে ব্যবহারের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমস্ত সংগঠনের কর্মীদের অনুশীলন করা দরকার।

শুধু মাত্র সাংগঠনিক ক্ষেত্রেই নয়, নিজস্ব বাসস্থান এলাকা বেলঘরিয়ায় পাড়ার আনন্দম ক্লাব, অজয় মুখার্জী স্মৃতি গ্রন্থাগার, স্থানীয় মহাকালী উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন, আনন্দম প্রাঙ্গণে একটি প্রাথমিক স্কুল গড়ে তোলা—এইসব বিভিন্ন সামাজিক কাজে তিনি জড়িত ছিলেন। ক্লান্তিহীন ছিল তাঁর পথ চলা।

সুশীল দাস ছিলেন একজন বিনয়ী, নিরহঙ্কারী, প্রচার বিমুখ মানুষ। সহজ, সরল ছিল তাঁর জীবনযাত্রা। কখনো দামি জামা কাপড় পরতেন না। উত্তেজিত হতেন না। কোনো সভাতে কোনো বিষয়ের মীমাংসা না হলে চাপিয়ে দিতেন না। পরে আবার আলোচনা করে বুঝিয়ে দিতেন কোনটা সঠিক। সদাহাস্যময় মানুষটি সকল কর্মীদের আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেন। শোষিত, বঞ্চিত, গরিব মানুষদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল নিখাদ। রাজনৈতিক নীতিগত প্রশ্নে নেতৃত্বের ভুলভ্রান্তি হচ্ছে বলে মনে হলে তিনি তার সমালোচনা করতেন, অবশ্যই প্রকাশ্যে নয়। দেখতে নরম প্রকৃতির মনে হলেও শ্রেণী শত্রু ও তাদের সহচরদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। তার মধ্যে কোনো দ্বিচারিতা ছিল না। কথায় ও কাজে একই ভূমিকা পালন করতেন। প্রকৃতপক্ষে তার চরিত্রে যে উচ্চতা আর ঋজুতা ছিল, সেই ঋজুতা প্রতিফলিত হয়েছে তার রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি ও সংগঠনের প্রতি আস্থার মধ্য দিয়ে।

৫ জুলাই, ২০১৪ সালে ব্যবহারিক কাজ ও তত্ত্বগত অধ্যয়নে সমৃদ্ধ মানুষটির জীবনাবসান হয়।

বর্তমান সময়টা খুবই কঠিন ও সঙ্কটময়। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা চরম স্বৈরশাসন নেমে আসছে। বহুত্ববাদ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও ধর্মনিরপেক্ষতা আজ আক্রান্ত। রাজ্যেও গণতন্ত্র ও স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার ভুলুণ্ঠিত। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থী শক্তির বিপর্যয় সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে দারুণ বিপদ তৈরি করেছে। এর থেকে হতাশাও তৈরি হচ্ছে। এই পটভূমিতে, সুশীল দাসের সংগঠন-আন্দোলন পরিচালনা করার যে দৃঢ়তা ও মতাদর্শের প্রতি তার সুগভীর আস্থা আমাদের এই সঙ্কটময় দিনে পথ চলার প্রেরণা যোগাবে। আমাদের পরিসরে এই পরিস্থিতির আমরা উত্তরণ ঘটাবই, কমরেড সুশীল কুমার দাসের জন্মশতবর্ষে এটাই হোক আমাদের শপথ, অঙ্গীকার। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
49th Year, 1st Special E-Edition, June 2021

Regd. No. : 18484/71

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি / ৬৬ /২১ তারিখ ঃ ১৭-০৭-২০২১

মাননীয়
প্রধান সচিব,
অর্থ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
নবান্ন হাওড়া

বিষয় ঃ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ ফর অল এমপ্লয়িজ এ্যান্ড পেনশনার্স ক্যাশলেস মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট স্কীম, ২০১৪'-এর সুযোগ-সুবিধার বাস্তব রূপায়ণ ও কার্যকারিতা প্রসঙ্গে

মহাশয়,

আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারী, পেনশনার এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা সংক্রান্ত অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কীম, ২০০৮ প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে পূর্বতন স্কীমের মৌলিক সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুণ্ণ রেখে রাজ্য সরকার ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি করে স্কীমটির নাম পরিবর্তন করে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ ফর অল এমপ্লয়িজ এ্যান্ড পেনশনার্স ক্যাশলেস মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট স্কীম, ২০১৪ কার্যকরী করেন। কিন্তু সম্প্রতি এই স্কীমের উপকার ভোগীরা বেশ কিছু গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়পূরণের (re-imbursement) বিপুল পরিমাণ দাবিগুলি (claims) দীর্ঘদিন ধরে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় পড়ে আছে। বিশেষতঃ কোভিড চিকিৎসাসহ বড় পরিমাণের বিলগুলি সময় নির্দিষ্টভাবে নিষ্পত্তির কোনো প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এছাড়া চিকিৎসাভাতা বৃদ্ধি (রোপারুল, ২০১৯ অনুসারে) সত্ত্বেও স্কীমের উপকারভোগীরা বহু তালিকাভুক্ত হেলথ কেয়ার অরগানাইজেশন (এইচ সি ও)-র নির্দিষ্ট পরিষেবা (ডাক্তারের পরামর্শ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিকিৎসা পদ্ধতি) থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমতাবস্থায়, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এ ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় সরকারী নির্দেশিকা প্রকাশ করার জন্য আন্তরিক অনুরোধ জানাচ্ছি।

(২) মেডিক্যাল সেলে অপেক্ষমাণ বড়ো পরিমাণ অর্থের ব্যয়পূরণের (re-imbursement) দাবিগুলি দ্রুত নিষ্পত্তিবিধান, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অন্যান্য কেসগুলির নিষ্পত্তি সাধন;

(খ) কোভিড চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়পূরণ বিলগুলির দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করা;

(গ) কোভিড চিকিৎসার ব্যাপারে উপকার ভোগীদের (beneficiaries) তালিকাভুক্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসার সুযোগ প্রত্যাখ্যান বন্ধ করা;

(ঘ) স্কীমে তালিকাভুক্ত স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধান সংস্থার (এইচ সি ও) তালিকাভুক্ত চিকিৎসকমণ্ডলী কর্তৃক চিকিৎসা ও সরকারী ভাবে নির্ধারিত হারে শল্য চিকিৎসা সহ অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির পরিষেবা সুনিশ্চিতকরণ;

(ঙ) চিকিৎসার ব্যয়বৃদ্ধি, কিছু পরীক্ষার খরচ ঊর্ধ্বহারে নির্ধারিত থাকায় (এম আর আর আই ইত্যাদি) এবং ক্যানসার, হার্ট, লিভার, কিডনি ইত্যাদির ও পি ডি খরচ ও ঔষধ বাবদ ব্যয়বহুল খরচের কথা বিবেচনা করে হেড অফ অফিসের অনুমোদন ক্ষমতা বৃদ্ধি;

(চ) সর্বোপরি ক্যাশলেসের ঊর্ধ্বসীমা ১ (এক) লক্ষ টাকা থেকে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা বৃদ্ধি (এ ব্যাপারে গত ১১ ফেব্রুয়ারি, ২১ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে প্রেরিত চিঠি সংযুক্ত করা হল)।

আশাকরি, রাজ্য সরকারের এই স্কীম প্রণয়নের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য অনুধাবন করে আপনি এ ব্যাপারে সবিশেষ তৎপর হবেন এবং প্রয়োজনীয় সরকারী ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

Memo No. Co-ordi/57/21 **Date : 20/07/2021**

To
The Principal Accounant General (A&E)
West Berngal,
Treasury Buildings,
2, Govt. Place (West),
Kolkata - 700 001.

Sub.: Implementation of Schenme for payment of pension and gratuity on the date of Superannuation and Seltlement of Revision of Pension cases of State Government Pensioners.

Sir,

We are extremely sorry to encroach on your precious moments for some urgent issues of ours, for your kind intervention towards its early disposal.

You are well aware that the Government of West Bengal had introduced the Scheme for payment of pension and gratuity on the date of Superannuation of the government employees in the year 1996 in collaboration with your august office. Since then serious and sincere efforts have been made on the part of your office to achieve the desired goal.

But, sorry to say that very recently it was brought to our knowledge from all over the State that the Settlement of pensioners' claims are not coming back to the respective offices of the Superannuating employees within due time perhaps due to lockdown and other hazards created by Covid 19 pandemic.

On the other hand, we have been experiencing that a huge no. of cases of revision of pension/Family Pension, Gratuity and Commulation of Pension of post 01.01.2016 pensioners and arising out of implementation of W.B.S.(ROPA) Rules, 2019 remain unsettled for considerable periods that too perhaps for the same reasons as mentioned above.

You would surely appreciate that delay in settlement of Pension Cases causes extreme hardship to the retired Government employees particularly in these pandemic days and at a time of constant price rise of the essentials.

In the circumstances, we urge upon you to kindly look into the matter and consider all appropriate measures so that members of the staff in your office who are involved in the process of Sanction of Pension/ Revision of pension endeavour to settle those pending cases as expeditiously as possible to reach the targeted goal and give relief to the incumbents.

We would also like to meet you in person to discuss the issue of our concern on a date and time convenient to you, amidst your busy schedule at the earliest.

Sincerely yours,
Bijay Sankar Singh.
General Secretarty.

পূর্ব বর্ধমান জেলায় রক্তদান কর্মসূচী

বিক্ষোভ কর্মসূচী বীরভূম

ইয়াস ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ বণ্টন (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

বিক্ষোভ কর্মসূচী দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বিক্ষোভ কর্মসূচী আলিপুর দুয়ার

সমস্ত হাসপাতাল কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সহ সমস্ত নাগরিকদের বিনামূল্যে কোভিড ভ্যাকসিন দিতে হবে—এই দাবিতে এস এস কে এম হাসপাতালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে অবস্থান কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

বিক্ষোভ কর্মসূচী নব মহাকরণ

বিক্ষোভ কর্মসূচী দক্ষিণ দিনাজপুর

বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিজনিত লকডাউনের কারণে জুন সংখ্যার মুদ্রণ সম্ভব হলো না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তী সংখ্যা থেকে যথারীতি মুদ্রিত পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।
—পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।